অযান্ত্রিক

তৃতীয় বর্ষ, বিশেষ বইমেলা সংখ্যা

মাঘ, ১৪০৯

হারানো শৈশব, হারানো স্বপ্ন

প্রকাশস্থল:
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি,
খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://ajantrik.8m.net

প্রচ্ছদ : জীবেন্দু মণ্ডল
অলংকরণ : শিবশংকর রায়, সুদীপ সরকার, সুজয় দাস

সম্পাদক : সোমেশ প্রসাদ রায়, শুভদীপ রায়, শুভ্রদ্যুতি সরকার

প্রকাশক : সিদ্ধার্থ সেন, আই. আই. টি. খড়গপুর
মুদ্রণ : ইমপ্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মেনকা স্ক্রিনো আর্ট, বক্সীবাজার, মেদিনীপুর
বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইন্ডিং, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯

সংগ্রহমূল্য: ১৫ টাকা

আপনার অপ্রকাশিত মৌলিক লেখা, অভিমত, সমালোচনা ও পরামর্শ পাঠান এই ঠিকানায় :
Somesh Prasad Roy,
C-202, Nehru Hall, IIT Kharagpur, 721302.
Email: ed_ajantrik@yahoo.co.in

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://ajantrik.8m.net

বানানের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'আকাদেমি বানান অভিধান' (তৃতীয় সংস্করণ) যথাসম্ভব অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

পনেরো বছর তিনমাস ৬

কবিতাগুচ্ছ - ১
ফকির ইলিয়াস ১০
দীপ্তি হালদার ১১
রুচিস্মিতা ঘোষ ১১
উত্তমকুমার রায় ১৩
শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য ১৪

দিনগুলো ১৬
তাতাই রূপকথা হবে ১৭
বেড়ি ভাঙার শব্দ ২০
ম্যাকশৈশব এবং ফেলে আসা ভোরবেলা ২৮
স্বপ্নের আমি, আমার স্বপ্ন ৩৪
যা হারায় না ৩৮

চিলেকোঠা ৪২
ইঞ্জেকশন ৪৬
হবি ৫০

তারা তিনজন ৬০

কবিতাগুচ্ছ - ২
কলিকা চট্টোপাধ্যায় ৬৫
অরিন্দ্রজিৎ চৌধুরি ৬৬
শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭
অগ্নীশ্বর কুন্ডু ৬৮
সুমন্ত্র রায় ৭০
নাসিম আখতার ৭১

নিয়মিত বিভাগ

হরিষে বিষাদ ৭২
হযবরল ৭৪

আজকের থিয়েটার ৭৯
কবিতার গল্প ৮৪

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি : ফেলে আসা ২০০২ ..... ৮৭

শিলপী - ভ্যাসিলি আকিমোভিচ আরলাসিন

সম্পাদকীয়

আরও একটা বইমেলা চলে এলো। বাঙালির এখন একাদশে বৃহস্পতি। বাতাসে এখন বইয়ের ম-ম গন্ধ। এরই মধ্যে আরও হাজারটা নতুন প্রকাশনার ভিড়ে ঠাঁই করে নিল অযান্ত্রিক। বাকিদের সাথে সাথে অযান্ত্রিকও কম-বেশি উল্টে-পাল্টে দেখবেন বই-পাগলা বাঙালি। ঝকঝকে ছাপার অক্ষরে, মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে, পত্রিকার আকারে অযান্ত্রিকের আত্মপ্রকাশ এই প্রথম, যদিও এটি অযান্ত্রিকের সপ্তম সংখ্যা। আগেরগুলি ছিল দেওয়াল পত্রিকার আকারে বা আট-দশটা পাতা একসাথে স্টেপল করে কোনোমতে হাতে ধরিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থায়। আর ajantrik.8m.net -এ ছিল এর ইন্টারনেট সংস্করণ। হাজারটা নতুন পত্রিকার আত্মপ্রকাশের ভিড়ে তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন - কেন এই অযান্ত্রিক? কাদের অযান্ত্রিক? কীসের তাগিদে অযান্ত্রিক?

অযান্ত্রিকের জন্ম ২০০১ সালে আই. আই. টি. খড়্গপুরের ক্যাম্পাসে। প্রাথমিকভাবে এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ক্যাম্পাসের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বাংলার প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাবের আর পানপরাগ সংস্কৃতির আগ্রাসনের হাত থেকে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য আমাদের প্রয়াসকে একটা প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়ার তাগিদেই। তবে পরবর্তীকালে অযান্ত্রিকের ইন্টারনেট সংস্করণ বেরনোর সাথে সাথে দেশ-বিদেশের অনেকেই আমাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। তাঁদের সেই সহযোগিতাই আমাদের, ক্যাম্পাসের বাঙালি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছে এই সংখ্যাটি প্রকাশে।

অযান্ত্রিকের এই প্রথম বড়ো-সড়ো সংখ্যাটিতে 'হারানো শৈশব, হারানো স্বপ্ন'কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাটকের মধ্যে দিয়ে। এর অনেকটা জুড়েই তাই ফিরে ফিরে এসেছে আমাদের হারিয়ে যাওয়া শৈশব - স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। এই সংখ্যাটি তাই উৎসর্গ করা হল তাঁদের, যাঁদের এখনও শৈশব অপহৃত হয়নি; তাঁদের, যাঁরা এখনও স্বপ্ন দেখেন।

পনেরো বছর তিনমাস

তীর্থজ্যোতি সরকার

বুবুনের আজ মন খারাপ। ও একটা লেখা পাঠিয়েছিল শারদীয়া 'রঙবেরঙ' পত্রিকায় - আর তার সঙ্গে একটা চিঠি। চিঠিটা লেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল এই কারণে যে ও পত্রিকার ছোটদের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগে লেখাটা পাঠায়নি। 'ছোটদের বিভাগ' - হুঁ, ভাবলেই হাসি পায় বুবুনের। তিন-চারটে রঙ-প্যাস্টেলে আঁকা কচি-কাঁচাদের 'বসে আঁকো' ছবি আর সদ্য কিশোরদের অন্তমিল ছড়া - এর মধ্যে বুবুনের লেখা? আর সবচেয়ে বড় কথা, ঐ বিভাগটার জন্য তো মাত্র চারটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ। ওতে তো বুবুনের উপন্যাসের শুরুটাই হবেনা ঠিক করে। হ্যাঁ, বুবুন একটা উপন্যাসই পাঠিয়েছিল পত্রিকার দপ্তরে। সঙ্গের চিঠিটায় লিখেছিল বয়সসীমার দিক থেকে যদিও সে ঐ 'ছোটদের বিভাগ'-এর একজন তবু সে চায় নিয়মিত বিভাগেই লিখতে। সে ছবি আঁকতে মোটামুটি পারে, কবিতা পড়তে ভালোবাসে, কিন্তু ছড়া লিখতে উৎসাহ নেই। সে যে উপন্যাসটা লিখেছে তার স্থান সঙ্কুলান হবেনা ঐ কচিকাঁচাদের বিভাগে। সঙ্গে অবশ্য তার বয়সটাও উল্লেখ করতে ভোলেনি বুবুন।

পনেরো বছর তিনমাস।

নাঃ আজ মনে হচ্ছে চালে ওটাই মস্ত ভুল হয়েছে বুবুনের। নিশ্চয় চিঠিটা আগে পড়েছেন সম্পাদক আর তাতেই উপন্যাসটা না পড়েই সরিয়ে রেখেছেন। স্বাভাবিক - অত্যন্ত স্বাভাবিক। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে তিনমাস বাড়িতে বসে থাকার সময়ে এরকম কত গল্প-উপন্যাসই তো বেরিয়ে আসে ঐ ওদের হাত দিয়ে, যারা পনেরোয় পা দিয়েছে।

পনেরো বছর তিনমাস।

কিন্তু সেটাই কি ঠিক হল? মধ্যযুগীয় ইউরোপিয় সামন্ততন্ত্র, পিথাগোরাসের উপপাদ্য আর জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমীকরণহীন এই 'মাধ্যমিকের পরের তিনমাস' এর অখন্ড অবসরে অনেক কিছুই বেরিয়ে আসে পনেরো বছর তিনমাসের হাত থেকে। ড্রয়িং খাতা শেষ হয়ে যায়, কবিতার ডায়েরিটা ফুরোবে ফুরোবে ভাব করে। এমনকি ছোটগল্প বা নাটিকার মকশো চলে ওই অর্দ্ধেক শেষ হওয়া ভূগোলের মানচিত্র প্রাকটিসের খাতাটায়। কিন্তু উপন্যাস? না না, আজকাল শারদীয়া পত্রিকার কুড়ি পাতার 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' নয়, রীতিমত সাড়ে তেষট্টি পাতার রোম্যান্টিক, বর্ণময় আর - আর ... রোমহর্ষক? না, এমন কিছু তো ছিলনা ওর লেখাটায় যাতে উত্তেজনায়, আতঙ্কে, শিহরণে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। উপন্যাসটা ছিল একটা অনুভূতিকে নিয়ে ... না, না, একটা কেন, অনেক অনেক ভাবনা আর অনুভূতিকে নিয়ে। নায়ক? সাউথ পয়েন্টের দশম শ্রেণির ঋতম রায়চৌধুরি ... নাঃ! সত্যি কথাটা হল তার ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা এই কিংশুক সেনগুপ্ত ওরফে বুবুন। আর নায়িকা? থমথমে আকাশের মুখে পাঁশুটে গোঁফের মতো ওই মেঘটা, কিংবা গন উইথ দ্য উইন্ডের কেটি শার্লট কিংবা ... হতচকিত বুবুনের হাতে গুঁজে দেওয়া সেই অপ্রত্যাশিত নিউ ইয়ারস্ গ্রিটিংসের কার্ডটা। শুধুই কার্ডটা, না তার ... তার প্রেরিকা ওই মুখচোরা মেয়েটা - প্রিয়ংবদা? আবার হাসি পায় বুবুনের। এতগুলি নায়িকা নিয়ে হবে কী? কাকে সময় দেবে ঋতম রায়চৌধুরি? আরও যে অনেক কাজ - বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ইতিহাস, ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান, মিলন সঙ্ঘের সাথে ম্যাচ, শরৎ রচনাবলীর প্রথম আস্বাদ, ব্রায়ান অ্যাডামস, জীবনমুখী, কার্ডের পাল্টা কার্ড ... হাজার হোক বয়সটা তো তার বুবুনেরই কাছাকাছি।

তাহলে সেটিকে বিবেচনা করে দেখতে পত্রিকার কোনও অসুবিধা নেই ..."

অসহ্য লাগে বুবুনের এই 'ছোট'র অজুহাত। না হয় সে সবে ক্লাস ইলেভেনে পড়ে, না হয় তার ঠোঁটের নিচে এখনও হালকা অস্পষ্টতা, না হয় এখনও সে বাবা-মার সাথে বইমেলা যায়, তবুও তো সে বড় হচ্ছে, সে বুঝছে, শিখছে, হাসছে, কাঁদছে। সে না ভেবেছিলো রিমঝিম ... মানে ওই প্রিয়ংবদাকে বলবে তার সাথে বইমেলা যেতে? না হয় সাহসে কুলোয়নি বাবা-মাকে টেক্কা দিয়ে শেষপর্যন্ত কাজটা করার, কিন্তু ভেবেছিল তো? আর এইটাই বা কেমন বোকা-বোকা কথা যে 'ছোট'রা উপন্যাস লিখতে পারবেনা? তাদের জন্য শুধু ছড়া-ছবি আর হাসির গল্প? কী দরকার বাপু এতরকম নাম হবার - এত বিভাগ, উপবিভাগ? গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমনকাহিনী, পত্রসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, আত্মজীবনী ...

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোথায় যেন পৌঁছে গেল বুবুন। সে একটা অদ্ভুত রাজ্য। সেখানে রাস্তায় অদ্ভুত পোশাক পরা মানুষরা হাঁটছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল রাস্তা ঘাট, বাড়ি ঘর সবই বই দিয়ে তৈরি! গাছের পাতা সবুজ নয়, ছাপানো পৃষ্ঠা! বুবুনকে কেউ বলে দেয়নি তবুও ও যেন নিজে থেকেই বুঝতে পারছে ওই যে মস্ত ভারি জোব্বা আর কারুকার্য করা পাগড়ি পরে আর নাগরা জুতো পায়ে লোকটা আসছে ওর নাম 'উপন্যাস'। আর ওপারের রাস্তায় ওই যে চলেছেন ফুলবাবুটি, আদ্দিরের গিলে করা পাঞ্জাবী আর মিহি ধুতি পরে, ওনাকে সবাই ডাকে 'কবিতা' বলে। উপন্যাসবাবুর সঙ্গে কথা বলার জন্য একটু জলদি পা চালাতেই প্রায় ধাক্কা লাগে আর কি একটি রোগামতন ভালোমানুষগোছের লোকের সঙ্গে। এ মক্কেল 'ছড়া' না হয়ে যায়না - বুবুন ভাবল মনে মনে।

উপন্যাসকে ধরে নিজের পরিচয় জানাতেই গোঁফের নিচ দিয়ে মিটিমিটি হেসে সে বলে, "কী বুবুনবাবু, আমাকে তো পাঠিয়েছিলে সাজিয়ে-গুজিয়ে পত্রিকার দপ্তরে? সম্পাদক ব্যাটা তো আমাকে দেখেই খাপ্পা। আমি নাকি এই বিশাল বপু নিয়ে তার বিজ্ঞাপনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা অতি আদরের জায়গাটা দখল করে নেব! সে ব্যাটা তো ঢুকতেই দিলনা আমায়। তার উপর সাজপোশাকে তোমার পনেরো বছরের হাতের ছাপ, সম্পাদকের মতে সেটা নাকি খুব একটা উঁচুদরের কাজ হয়নি। কী আর করা যাবে বলো? গুটিগুটি ফিরে এলাম।"

"আচ্ছা উপন্যাসদা, অপরাধ নেবেন না, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছিনা। আমি যদি আপনার বদলে কবিতা ভাইকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠাতুম, তাহলে বোধহয় সে এন্ট্রি পেত, তাই না?" বুবুনের সরাসারি প্রশ্ন।

গোঁফ চুমরিয়ে, মাথা চুলকে কতকটা ভাবল উপন্যাস। তারপর বলল, "আমার মনে হয় সেটা উচিৎ হতোনা। যদিও এক্ষেত্রে ওই বিজ্ঞাপনলোভী সম্পাদক কী করত বলা মুশকিল। তবে বলার বিষয়টা যদি তীব্র হয়, বলার ইচ্ছা যদি সৎ হয়, তাহলে সেটা আমার মুখ দিয়েও বলা যেতে পারে, আবার ওই কবিতার মুখ দিয়েও।" কবিতাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে উপন্যাস বলে বুবনকে, "ফয়সলাটা তোমার সামনে হয়ে যাওয়াই ভাল।"

কবিতা আসতেই কিন্তু বুবুনের সব গুলিয়ে গেল। পত্রিকা, সম্পাদক সব হারিয়ে গিয়ে ওর মনে এল সেই দুষ্টু প্রশ্নটা, যেটা ওকে খোঁচাচ্ছিল সারাদিন।

"আচ্ছা, আপনারা এত আলাদা-আলাদা রকমের কেন বলুন তো? শুধু আপনারা দুজন নন, আরও আছেন, 'প্রবন্ধ', 'রম্যরচনা', 'ছড়া', 'ভ্রমনকাহিনী', 'কাব্যনাট্য', 'নাট্যকাব্য' ... আরও কত কে? প্রত্যেকের জন্য আলাদা পোশাক, আলাদা জুতো, আলাদা টুপির ব্যবস্থা করতে করতে তো আমাদের প্রাণ যায়। আমার মনে হয় আপনাদের সবাইকে এক ছাঁচে ঢেলে গড়লে

কি ক্ষতিটা হত?"

স্পষ্টতই গম্ভীর হয়ে গেল দুজনেই কথাটা শুনে। অল্পক্ষণ নীরবতার পর বলল উপন্যাসই, "বুবুনবাবু, গোড়ায় গলদ হচ্ছে যে তোমার। সাজপোশাক গড়তে তোমার প্রাণ যায় বলছ। কিন্তু ওটার পেছনে অত খাটতে কে বলেছে তোমায়? ভেতরের লোকটাকে গড়তেই তো আসল মজা। তোমার মনের ভেতরেই লোকটার বাস। সেখানে তো কোনও নির্দিষ্ট ছাঁচ নেই।মন যেমন গড়ে, তেমনই হয়, যেমন বলে তেমনই চলে, যেমন ভাবে তেমন বলে।"

"যেমন ধরো", কবিতা বলে ওঠে এবার, "কোনও এক নারীর চোখ আমার কাছে বেতের ফলের মতো নীলাভ, ব্যথিত। তার শরীরে বিমর্ষ পাখির রঙ আর সোনালি রোদের গন্ধ।"

"সেই নারীর শরীরই আমার কাছে আনে ঘাসের, মাটির আর ঘামের গন্ধ। তার শরীরে তখন সোনালি ধানের গন্ধ। ক্ষতি তো নেই কিছু বুবুনবাবু। কেটি শার্লটের দিকে চোখ তুলে তাকাই আমি, আর ও তাকায় বনলতা সেনের দিকে। নিবিড় গভীর আশ্রয় তো দুজনের কাছেই আছে। ও বেছে নিয়েছে দারুচিনি দ্বীপ, আর আমি হয়তো শহর কলকাতা। কিন্তু বৃষ্টি পড়ে দুজায়গাতেই, মেঘের যাতায়াতে তো বাধা নেই।", বলে উপন্যাস।

"কীসের বৃষ্টি, কোথাকার মেঘ?" আবার প্রশ্ন বুবুনের।

"কথার মেঘ গো, ভাবের রসে ভরা। রাশি রাশি চিন্তার পেঁজা তুলোয় ঠাসা সে এক মজাদার মেঘ। সে তো ভূগোল দেখেনা, ইতিহাস দেখেনা, বাঁকুড়া আর বুয়েনস এয়ার্স তার কাছে আলাদা নয়, তফাৎ নেই চর্যাপদ আর রবীন্দ্রযুগে। সে নিজের খেয়াল খুশি মতো বৃষ্টি ঝরায়।"

"বৃষ্টি?"

"হ্যাঁ, বুবুনবাবু। আমরা তাকে বলি 'শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর'। আলাদা আলাদা মানুষ হরেক রকম কাচের মধ্যে দিয়ে সেই বৃষ্টিকে দেখে, তার শব্দে অনুষঙ্গ তাদের কাছে আলাদা। কিন্তু ভিতরের রসটি খাঁটি থাকা চাই। তবেই তো মন ভিজবে, প্রাণ জুড়োবে।"

"হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটতে থাকা মানুষটা পাবে দুদণ্ডের আশ্রয়", স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলে ওঠে কবিতা। পরক্ষণেই যোগ করে হেসে, "না না, নাটোরের কথা বলছিনা। জায়গাটা নেব্রাস্কাও হতে পারে। পাখির নীড়ের শান্তির আশ্রয়টুকু পেলেই চলবে।

গম্ভীরস্বরে বলে উপন্যাস, "আসলে মুশকিলটা কোথায় জানো? আমাদের সমস্যাটা অতো তীব্র নয় প্রবন্ধদা বা ছড়া ভাইদের মতো। ওদের চেহারাটা এমন জাঁদরেল, বা হাসি উদ্রেককারী যে সাধারণ মানুষ হয় দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেয় বা সাজসজ্জার ঘটা সরিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ভিতরের লোকটার কাছে পৌঁছনোর আগে।"

"তাহলে এর সমাধান কোথায়?" এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছে বুবুন।

"আর নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমের" প্রায় গেয়ে ওঠে কবিতা, "চাঁদ ফুল জোছনার গান ছেড়ে প্রিয় মনকে এবার আবরণটাকে খুলে ফেলতেই হবে।"

"কীরকম? কীরকম?", উৎসাহিত বুবুনের প্রশ্ন।

"সাজপোশাক, আভরণ, অলঙ্করণ ছেড়ে এবার যে একটু স্মার্ট হতে হবে বুবুনবাবু। না, চাঁদ ফুল জোছনা নয়, ও তো অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। কেরিয়ারসর্বস্ব, মেধাবী, বঙ্গসন্তানের অভিজাত কিন্তু রিক্ত জীবনের রক্তক্ষরণও হয়েছে অনেক। বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটের খুপরি ঘরে আমাদের দমবন্ধ হয়ে আসে। আরও মেদ ঝরাতে হবে, চেহারাগুলোকে হতে হবে আরও ঋজু। পিচের রাস্তায় তো অনেক চললাম। মাইলের পর মাইল ঘাস যে পড়ে রইল অনাদৃত। কফি হাউস, নন্দন, শেয়ালদা - কৃষ্ণনগর ডেইলি প্যাসেঞ্জারি, দুষ্টু-মিষ্টি প্রেম, বিংশ শতাব্দীর

মৃত ঈশ্বরের শবদাহ, ফ্রয়েড-রবীন্দ্রনাথের খিচুড়ি রান্নার চেষ্টা তো অনেক হল বুবুনবাবু। ওই যে বললাম বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট - সেখানে হাঁফিয়ে উঠলে ছুটে যাওয়ার একমাত্র জায়গা যেন বাঁকুড়ার লালমাটির দেশ। পল্লীবাংলার সজল সবুজ চিত্রাঙ্কণ, মফস্সলের ব্যর্থ মানুষের ক্রন্দন অনেক হয়েছে। এখনও কি সময় হয়নি চোখটা খোলবার? গুরুদেব বুঝি ভয় দেখিয়ে গিয়েছেন? কেউ এসে ছানিয়ে নেবে রস, নিকিয়ে নেবে রূপ?"

"আকাশের দিকে তাকানোর সময় হয়েছে বুবুন। সময় হয়েছে আন্তর্জাতিক হবার, আন্তর্কালিক হবার। বোঝার সময় হয়েছে যে দইওয়ালা বাঁকুড়ার লালমাটির দেশ থেকে আসেনি। আসেনি সে জীবনপুরের সীমানার বাইরে কোনও অজ্ঞাত দেশ থেকেও। সে এসেছে অ্যারিজোনা থেকে, সাহারা থেকে কিংবা তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের সেই দ্বীপটা থেকে যেখানে আঁকা রয়েছে সেই উন্মাদ ক্ষণজন্মা শিল্পীর জীবনের শেষ সৃষ্টি - 'সভ্যতা - কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, কোথায় চলেছি' ..."

"আর কতদিন এই অচলায়তন চলবে বলতে পারো? এতই কি বধির আমরা যে শুনতে পাবনা সোনালি ডানার চিলের পাখা ঝাপটানোর শব্দ? সে যে আমাদের নখে বিঁধে নিয়ে উড়ে যেত - লাশকাটা ঘর থেকে দূরে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, কাজলাদীঘির ঘাট এড়িয়ে, ময়নামোতির চর ডিঙিয়ে অনেক অনেক দূরে ..."

"কোথায়, কোথায় যাব আমরা?", উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস বুবুন।

"কালের জয়যাত্রার অনির্বাণ টিকা তো অনেক আগেই ললাটে পরেছিলাম বুবুন। কালের বীণা তো থেমে নেই। শুধু আমরাই শুনতে পাচ্ছিনা। মৃত প্রেমকে নিয়ে হা-হুতাশ করি আমরা। জানি সেই প্রিয় নারী আবার জন্মেছে 'এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদেশে'। যেতে হবে আমাদের শ্রাবস্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনীতে, যেতে হবে দারুচিনি দ্বীপে, দরকার হলে মালয় উপসাগর পেরিয়ে, শতাব্দী পেরিয়ে। মফস্সলের নয়, বাস্তিলের বন্দি মানুষগুলোর ক্রন্দন, লেকের ধারের নির্জনতা নয়, শান্তি সেখানেই যেখানে অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। প্রেম করার জন্যে অল্পে খুশি হলে চলবেনা বুবুন, চাই নন্দিনী, সুচেতনা বা কেটি শার্লটকে। চলো বুবুন। হাজার বছর ধরে হাঁটছি, না হয় আরও হাঁটব। কিন্তু যেতেই হবে সেই রোদভরা পৃথিবীতে, যেখানে বাংলা সাহিত্য adult, যেখানে বাংলা সাহিত্য আন্তর্জাতিক, যেখানে বাংলা সাহিত্য কালের পথিক ..."

শুনতে শুনতে যেন ঘুমিয়ে পড়ল বুবুন, নাকি জেগে উঠল ঘুম ভেঙে?

কবিতাত্রয়ী

ফকির ইলিয়াস

পঞ্চম প্রণয়

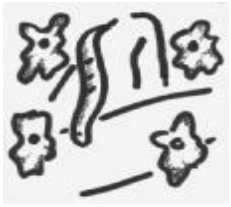

অন্তত এই সত্যটুকু আমরা সবাই জানি। বেদনারা আলো ভালোবাসে। সুখেরা ভালোবাসে অন্ধকার। সামনে রেখে বেদনার অবয়ব জন্ম নেয় প্রলয়ের পরাণ। তারপর আদিম পৃথিবীর সাথে ঘটে আধুনিক আকাশের পঞ্চম প্রণয়। উদ্ভাস অরণ্যকে আমরা সবাই চিনি। ঘরে ফিরে যেতে যেতে সাহসী ডাহুক যেমন উড়িয়ে যায় উষ্ণ পালক। উদ্‌গত উপাসনায় ঋজু মানুষ সমবেত হয় সমান্তরাল আকাশের মুগ্ধ সমীকরণে।

স্থাপতিক রাত

জলের অগ্রজ হয়ে কান্নারা বাঁচে। মেঘগুলো বেঁচে থাকে দূর নীলিমার বোন হয়ে। আর আমরা সপ্ত সবুজ থেকে অক্সিজেনের স্তর খুঁজে খুঁজে সাজাই নিসর্গের নিম। এই রক্তরসায়ন, এই জৈবিক জ্যোতিঃপদার্থ, একদিন সম্পূর্ণ আমাদের ছিল। বর্ণের বিশোধনে আমাদেরকে ভালোবাসা দিতো নদীর পরাগ। স্থাপতিক রাত আর সহযাত্রী হয়ে আসতো কাছে। সূর্যের সায়াহ্নে যেমন রংধনু আবার আনন্দে নাচে।

পূরক শিরার সাথে

মিশে থাকি পূরক শিরার সাথে। রক্তশূন্যতার শহর যখন ছেড়ে আসি তখনো জাগ্রত কোনো প্রহরী ছিল না। চারদিক ছিল ভরা আমাদের আত্মার ছায়ায়। এই ভূগর্ভ, এই জমাট ঝরনা সবকিছু পোঁতা ছিল পাঁজরের তলদেশে। স্থাপত্যের স্থবির মায়ায়। শেষরাতে চাঁদের দেখা পাবো বলে যেভাবে ধারণ করেছি মৃদু ঘুমহীন আঁধারের তারুণ্য, সেই ডাঙাকথা থেকেছে গোপন। তবু কাতর পাখির ঠোঁটে ঠোঁটে উড়িয়ে পত্রকণিকা অর্জুন অন্বেষণে ফিরেছি সমুদ্র যাপনে। পূরক শিরার ছায়া যা আজো খোঁজে আনমনে।

বিতংসভূক

দীপ্তি হালদার

তিন পা ডুবলে
ছুঁয়ে দিতে পারি চাঁদ
তিন পা ভাসলে
করতলে নাচে খাদ
তিন পাক খোল
চার পাক কষে বাঁধ
চল নীল,
খাই, খেয়ে ফেলি

যত দানায় ছড়ানো ফাঁদ।

কবিতার মৃত্যু নেই

রুচিস্মিতা ঘোষ

কবিতার মৃত্যু নেই
যতদিন রয়েছে এ মন।

স্বর্ণরেখ বর্ণময় বিচিত্র পেখম
আকাশে উত্তাল মেঘে সুরের মৃদং,
আদিগন্ত ধানক্ষেত, নুয়ে পড়া চাষী,
শূন্যদৃষ্টি মেয়েটির ব্যথাতুর হাসি,
ভাঙামন স্মৃতিক্লান্ত বিমর্ষ যুবক,

নানা রঙে রাঙা এই জীবনের সুস্পষ্ট স্মারক।

কবিতার মৃত্যু নেই
যত থাক ব্যর্থতার ছাপ,
বেদনায় থরোথরো হৃদয়ের রক্তাক্ত গোলাপ;
স্মৃতির মৌচাকে মন মৌমাছি গুঞ্জন,
কবিতার মৃত্যু নেই
যতদিন আছে এই মন।

নিরন্ন দিনের ভিড়, হতাশায় জ্বালাময় বুক,
ক্লান্তির বিষন্ন শয্যা, দারিদ্র্যের নির্মম কৌতুক,
অনাগত দিনের সংকেত; বর্ণময় স্তবক আশার;
বঞ্চিত ব্যথার কান্না, দীর্ঘশ্বাস বন্ধ্যা মৃত্তিকার
মনের মুকুরে ম্লান বিশাখার পুরোন হৃদয়,
বেদনার ছোঁয়া লেগে কবিতায় সঞ্চারিত হয়।

প্রভাতের সোনা রোদে, সবুজাভ পাতায় পাতায়,
শহীদের লাল রক্তে, কর্মদীপ্ত চোখের তারায়,
মৃত্যুহীন কবিতাকে পড়তে পেলাম।
কবিতা হয়েছে আজ জীবনের অক্লান্ত সংগ্রাম।

কবিতা হয়েছে আজ মনের মৃদং
কবিতার মৃত্যু নেই, যতদিন আছে এ জীবন।

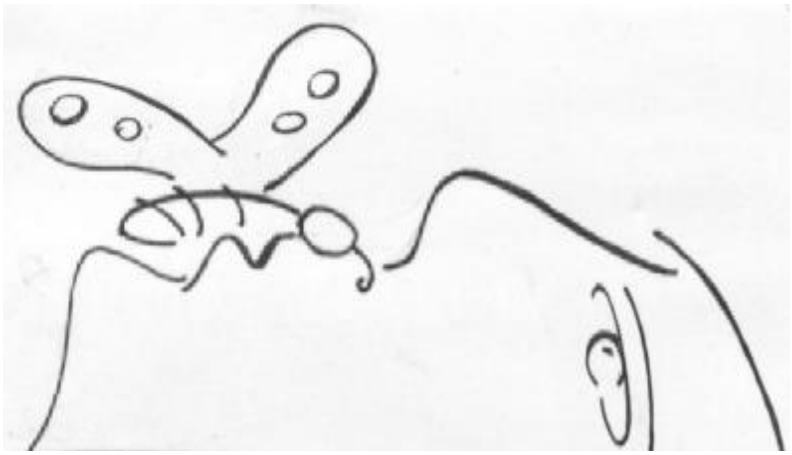

চারটি কবিতা

উত্তমকুমার রায়

পরিণামহীন এক বিস্ময়

অতিদূর হতে হেঁটে এসে দরজার কাছাকাছি
নিজেরই যেন মুখোমুখি পৌঁছবার আগে
মনে হয়, বারবার মনে হয়
জীবন মানে কেবলই সঞ্চয়
অথবা খেলা, সঞ্চয়ের খেলা, পরিণামের জন্য
পরিণাম না-জেনে পরিণামবিহীন এক খেলা
বলে হয়তো জীবন অপার রহস্যময়, এক বিস্ময়

একটি শিশু ও একটি স্বপ্ন

একটি শিশু
মুখ নুইয়ে সে তুলে নিল একখানা নুড়ি
হাতের তালুতে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল
বিস্ময় মাখা চোখে চেয়ে রইল এবং নুড়ি থেকে
তখন ঠিকরে বের হচ্ছে নীল সাদা আলো
পায়ের তলার সমভূমিতে ভেজা-ভেজা স্বপ্ন
খেলা করে, শিশুটি হাসছে ...

একদিন একবার

অন্ধকারের ঠোঁটে উড়ে এসে বসেছিল
একটি আলো
মিটমিট করছিল নক্ষত্রের মত
আলোর শরীর বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল ধূমকেতু
পৃথিবীর মাটিতে মিশে যাচ্ছিল অশ্রু হয়ে
অথচ আপন মনে গুমরে উঠছিল অন্ধকার
ওর বুকে থকথকে কান্না জমে আছে বহুদিন

সেই নরকেই আবার

আবার ফিরতে হবে সেই নরকে, ম্লান আলো, হিংস্র অন্ধকার
এবং গা-ঘিনঘিনে আর্দ্রতা, মশা-মাছি-আরশোলার বিরামহীন
বিচরণ, পুতিগন্ধের বাতাস, ছায়ামূর্তির রহস্যময় আনাগোনা
রামকৃষ্ণের ছেঁড়া ক্যালেন্ডার ভাঙা দেওয়ালে বোবা হয়ে থাকে
এই নরকে একমাত্র সজীব, হয়তো ব্যতিক্রম, যেন আমি
একমাত্র আপসবিরোধী ব্যর্থ বিপ্লবী আধখানা চাঁদের মত

এবং এভাবেই জানি আমি খুন হয়ে যাব একদিন

তোমার সাথে ইচ্ছা ছিল

শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য

তোমার সাথে অনেক কথা আমার মনের সকল ব্যথা
দিনের শেষে
কাজ ফুরোলেই রাত্রি আসে একটা মিনিট অবশেষে
তোমার পাশে।

তখন কিছু বলতে বাকি নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকি
খেই হারিয়ে
কাব্য তখন আসে না আর দশটা মিনিট বাঁধাধরার
যায় ফুরিয়ে।

ইচ্ছা ছিল গল্প করি তোমার সাথে স্বপ্ন ধরি
বন্ধুবিহীন
তোমার চোখে সুর খুঁজে পাই অবহেলায় গিটার বাজাই
আজ নিশিদিন।

তাইতো তোমার গন্ধ মেখে পাগলা হাওয়ায় দিকবিদিকে
উড়িয়ে দিলাম
ভোরেরবেলার একমুঠো গান একমুঠো গান
একমুঠো গান ।

হারানো শৈশব, হারানো স্বপ্ন

আমরা যখন এবারে প্রচ্ছদের বিষয় হিসেবে 'হারানো শৈশব, হারানো স্বপ্ন'কে বাছলাম, তখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন আমরা তো সবে শৈশব ছেড়ে পা দিয়েছি বৃহত্তর জীবনে। এখনই হারানো শৈশব বলে স্মৃতিকাতর হওয়া আমাদের সাজেনা; আর এটাই তো স্বপ্ন দেখার সময়, এই বয়সেই হারানো স্বপ্নের কথা বলাও আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। এটা বুড়োদের বিষয়। আমাদের মতো সদ্য যুবক-যুবতিদের নয়।

সত্যিই তো, আমরা কেন এ বিষয় বাছলাম? তার মানে আমাদের প্রজন্ম এখনই অনুভব করে কিছু না পাওয়ার বেদনা; কী? তা-ই আমাদের অজানা। এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও আমরা অনুভব করছি। আমরা আরও কিছু আশা করেছিলাম সমাজের কাছ থেকে, তা পাইনি । তাই আমাদের কাছেও শৈশব ও স্বপ্ন বেদনার - হারানোর।

'হারানো শৈশব, হারানো স্বপ্ন' বিষয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে। কী হারিয়েছে, কেন হারিয়েছে সব নিয়েই। কিন্তু তাতে আমাদের মত আশির শেষ বা নব্বইয়ের দশকে শৈশব কাটানো ছেলেমেয়েদের লেখা বা অবদান কতটুকু? তাই গতে বাঁধা প্রচ্ছদ নিবন্ধের ধারণার বাইরে গিয়ে আমরা গড়ে তুলতে চেয়েছি আমাদের প্রজন্মের চোখে 'হারানো শৈশব, হারানো স্বপ্ন' -এর একটি কোলাজ, যেখানে প্রতিটি লেখার প্রকাশভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। এবং হয়তো 'হারানো শৈশব, হারানো স্বপ্ন' -এর সংজ্ঞাও।

দিনগুলো

বৈশালী সাহা

ইচ্ছেনদীর ইচ্ছে হাওয়ায়
স্মৃতির স্রোতে নৌকা ভাসাই,
হারিয়ে গেছে সোনার দিন
ফিরবে না যে আর কোনদিন।।

ছিল 'হলুদ পাখি', রোজ দুপুর
মন উড়ে যেত তেপান্তর,
যেথায় ছিল রূপকথা আর -
গল্পদাদুর আসর।।

রূপকথাগুলো গেছে মিলিয়ে;
স্বপ্ন গেছে রঙ ফুরিয়ে।
এখন শুধু আছে বাকি,
মিথ্যে আশা, স্বপ্ন মেকি।

ফিরলনা সেই 'হলুদ পাখি'
পালিয়ে গেল দিয়ে ফাঁকি,
শৈশবের সেই দিনগুলো -
দেবে না যে আর উঁকিঝুঁকি।

তাতাই রূপকথা হবে

রণদেব দত্ত

তাতাই রূপকথা হবে, অবশ্য তাতাই ঠিক রূপকথা হতে চায় না, সে রূপকথা হতে ঘেন্না করে। তবুও তাতাইয়ের ধারণা, সে রূপকথা হয়ে যাবে। তার বাড়ির লোকেরা, বিশেষ করে তার একমাত্র ছোটবোনের দৃঢ় ধারণা, একদিন সত্যি-সত্যিই সে চলে যাবে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীদের দেশে, অথচ তার একমাত্র ছোটবোন যে রূপকথার জগৎ সম্বন্ধে দারুণ জানে, সেরকম কিছু নয়, কারণ মিলির ছোটবেলা কেটেছে ঠাকুমাবিহীন, যে হোমে ঠাকুমা থাকতেন সেখানে তাদের যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাতাই তবু জীবনের প্রথম দুবছর ঠাম্মাকে দেখেছিল। তাই তাতাই পরীদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জানলেও জানতে পারে। কিন্তু মিলি - ও তো স্পাইডারম্যান, টিনটিন ছাড়া কিছু জানেও না, টিনটিনদেরও চিনত না, যদি না তাদের বাড়ির কার্টুন নেটওয়ার্কের চ্যানেলটা কেবল্ অপারেটররা দিত। সারা বাড়িটায় মিলির ওই একটাই বন্ধু, টিভি। ওর দাদাকে ওর ঠিক বন্ধু মনে হয়না, তাতাইয়ের বদখৎ-মোটাসোটা শরীর দেখে মিলি রূপকথার চরিত্রগুলো ভাবার চেষ্টা করে, তার দাদাকে রূপকথার কোন্ চরিত্রে মানায় বহুদিন ধরে ভেবেও তা বার করতে পারেনি। তাই দাদার সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারেনা, বলা যায় না যদি সত্যি-সত্যিই রূপকথার দেশে চলে যায় দাদা, তাহলে ও কার সাথে বন্ধুত্ব করবে নতুন করে? টিভিটার কোথাও যাবার ভয় নেই। তাই সেই বন্ধু মিলির।

এখন মিলি বড় হয়েছে, কিশোরী জীবনের অচেনা ভালোলাগাগুলো অনুভব করতে শিখেছে। তাই তার ছোটবেলার বিশ্বাসগুলো নিতান্তই ঠাট্টায় পরিণত হয়েছে। ঠাট্টা অবশ্য আরও অনেকেই করে, তাতাই ঠিক বুঝতে পারেনা, কিন্তু এমন মোটাদাগের ঠাট্টাগুলো না বোঝার মত কাঁচা বয়েস নয় তাতাইয়ের। সদ্য সদ্য সে ষোলোয় পা দিল, সুতরাং তার রূপকথা সংক্রান্ত ইয়ার্কিগুলো না বোঝার কথা নয়। আসলে তাতাই বুঝতে চায়না, আর বুঝবেই বা কেন, সে তো বিশ্বাস করে একদিন সত্যিই সে রূপকথা হবে, আর তাতাইয়ের বিশ্বাসটা ভীষণ পোক্ত, সে যা বিশ্বাস করে, কোনোভাবেই তাকে সেখান থেকে টলানো যায়না। যেমন সে বিশ্বাস করে সে ভীষণ বোকা। তখন তাতাইয়ের বয়েস সবে h¡L¡¢qw¡ HL¢ea¡ ¡L h¡h¡L hm¢m, "আমি স্কুলে যাবনা, কারণ আমি বোকা। স্কুলে শুধু চালাক ছেলেরা যায়।" অথচ পরীক্ষায় সে খুব কম নম্বর পেয়েছিল সেরকমটি নয়, বরং বরাবর সে প্রথমসারির ছাত্র হিসেবেই গণ্য হয়েছিল। সুতরাং যাঁরা একথা বিশ্বাস করেন যে পরীক্ষায় অঢেল নম্বর পেলেই ছাত্র বুদ্ধিমান, তাঁদের কাছে তাতাইয়ের এমন স্বীকারোক্তি বালখিল্যপনা ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তাতাইকে অনেকভাবে বোঝানো হয়েছিল, যারা পরীক্ষায় প্রচুর নম্বর পায়, কঠিন কঠিন অঙ্ক অনেকসময় নিজে থেকেই করে ফেলে, তারা আর যাইহোক, বোকা নয়। কিন্তু বোঝানোই সার, তাতাইয়ের বিশ্বাস থেকে তাকে একফোঁটাও টলানো গেল না, তাতাই স্কুলে যাওয়া একরকম বন্ধ করে দিল।

সেদিন থেকে তাতাইয়ের একমাত্র আস্তানা তার একান্ত নিজস্ব ছোট্ট দশফুট বাই দশফুটের ঘরটা। ঘরটায় একটা মাঝারিমাপের জানলা আছে। ফ্ল্যাটবাড়িতে একটা জানলা থাকেই, সেই নিয়ম মেনেই এই ঘরেও একটা জানলা করা হয়েছে। সেই জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকলো, কি ঢুকলো না তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই কন্সট্রাকশন কর্মীদের। তাই ঘরের উত্তরদিকে জানলাটা বসানো, অবশ্য এছাড়া কোন উপায়ও ছিলনা, কারণ বাড়িটা যেভাবে তৈরী, আর কোনদিকেই জানলা বসানোর কোনও সুযোগ ছিলনা। হাওয়াও প্রায় ঢোকেইনা, ঢুকলে শীতকালে, যখন তার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তাতাইয়ের জীবনে অধিকাংশ ঘটনাই এমন ঘটে যার কোনও প্রয়োজন নেই। যেমন এই উত্তুরে হাওয়াটা, মাঝারি মাপের জানলাটা, ওর রূপকথা হয়ে যাবার চিন্তাটা। তাতাই মাঝেমাঝে ভাবে, এত অল্পবয়সে ওর শরীরটা এত বিশাল হবারও কোনও প্রয়োজন ছিলনা। ষোলো বছর বয়সেই ওকে কুড়ি বছর বয়সের বিশাল বদখৎ চেহারার যুবক বলেই মনে হয়। তাই প্রায় সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। এটা যে তাতাই জানেনা তা নয়, কিন্তু তা নিয়ে ওর বড়ো একটা দুঃখ নেই। সামান্য লজ্জাবোধ আছে। ওর এক মাসি বলে ছোটবেলা থেকে গাদাগাদা কোল্ডড্রিংক্স খেয়ে ও এত মোটা হয়েছে। অবশ্য ওর মাসি ডাক্তারি শাস্ত্রের বড় একটা ধার ধারেনা। তবুও মাসির কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে তাতাইয়ের। তাই এখন গাদা গাদা কোল্ডড্রিংকস খাওয়াটা ওর জীবনের একটা অপ্রয়োজনীয় ঘটনা বলেই মনে করে তাতাই।

তাতাই ওর ঘরের চৌকিটা জানলার কাছে পেতেছে, যাতে ঘুম থেকে উঠেই জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখতে পায়। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে ওর সবচেয়ে ভালো লাগে। আর ওর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগা কাজটা ও সবচেয়ে

আগে করতে চায়। তাছাড়া ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে পরিচিত রাস্তাটা দেখতে পেয়ে ও সবার আগে নিশ্চিন্ত হয় - যাক, এখনও সে রূপকথা হয়নি। তারপর হাতমুখ ধুয়ে এসে নিচে যায় সকালের খাবারটা খেতে, খেয়ে এসে আবার বসে যায় জানলার কাছে। আজকাল জানলা দিয়ে দূরের একটা মাঠ দেখে সে, কিছুদিন আগেও যেখানে ছোট ছোট ছেলেরা ক্রিকেট বা ফুটবল খেলত, কখনও বা অকারণে শুধু দৌড়েই যেত। এখন সেখানে নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। এখনও কিছু ছেলে সারাদিন দৌড়েই যায়। কিন্তু অকারণে নয়, ওদের মাথায় ইঁট বোঝাই করা থাকে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ইঁট বয়ে নিয়ে যায়। এখন তাতাই ভাবে, ওদের মতো হলে বেশ ভাল হত। কারণ বোকা লোকেদের মনের মতো একটা কাজ সে খুঁজে পেয়েছে। ওর মনে হয়েছে ইঁট বইতে কোনো বুদ্ধি লাগেনা। আর ইঁট বইলে রূপকথা হবার সম্ভাবনাও বেশ কম, কারণ ওর ধারণা রূপকথার দেশে ইঁট বইবার লোকেদের কোনো স্থান নেই। তাই একদিন ঘরে তুলেছিল কথাটা। সেদিন রোববার ছিল, বাবার ছুটি, বোন ঘরে আছে। তাই সবাই মিলে খেতে বসেছিল। তখনই বাবাকে বলেছিল কথাটা - "আমি কাল থেকে সামনের মাঠে ইঁট বইতে যাব।" মা তখন সামনে দাঁড়িয়েই খাবার পরিবেশন করছিলেন। বাবা সবে ভাত মুখে তুলেছিলেন। তাতাইয়ের কথা শুনে ভীষণ একটা বিষম তুলেছিলেন। মায়ের চোখ ছানাবড়া, মিলির চোখে বিস্ময়। বহুক্ষণ পরে মায়ের মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। আর অস্ফুট কাতরতা - "আবার শুরু হল।" মিলি মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল তার দাদা মাঠের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ইঁট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা চিন্তা করে ওর ভীষণ হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু বাবা মায়ের থমথমে মুখ দেখে হাসতে সাহস পায়নি। তাতাইয়ের বাবার সেদিন বোধহয় ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের মত তিনি বহুকাল ধরে তাঁর ছেলের এরকম বহু জেদ ক্ষমা করে এসেছেন। সেদিন বোধহয় তাতাই একজন ছেলে তার বাবার কাছে যতগুলো অন্যায় আবদার করার যোগ্যতা লাভ করে থাকে, সেটা অতিক্রম করে ফেলেছিল। অবশ্য কাজটা ভারি অন্যায়, ইঁট বইবার কাজ কেবলমাত্র বাস্টার্ডরা করে থাকে। আর যেহেতু পিতৃপরিচয় আছে, এবং যেহেতু সে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য তার এমন কাজ করার অধিকার নেই সে জানতনা। তদুপরি গোবরগণেশ মার্কা চেহারা নিয়ে এই কাজ করা যায়না তাও সে জানতনা। অপমানিত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত তাতাই যখন তার একমাত্র আশ্রয়, তার দোতলার ঘরটায় ফিরে আসছিল তখন শুনতে পায়নি তার মায়ের আরেক কাতর ধ্বনি - "আজ বোধহয় আরেকটা চৌকি ভাঙবে।"

আর একটা চৌকি ভাঙার শঙ্কাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। তাতাইয়ের এটাও একটা খেলা এবং নিশ্চিতভাবেই সবার কাছে অপ্রয়োজনীয়। তাতাই যখন কারও উপর রেগে যায় তখন তাকে শত্রু ভাবে। সেই শত্রুকে মারার এক অভিনব খেলা খেলে। সে তখন জানলায় উঠে দাঁড়ায়, কল্পনা করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী খাটে শুয়ে বা বসে আছে। তখন পরম বিক্রমে জানলা থেকে খাটের উপর লাফিয়ে পড়ে, এবং ঘটনাটা চলতেই থাকে যতক্ষণ না তার শত্রুকে সে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী করেছে বলে সে মনে করে। ফলস্বরূপ খাট-ভাঙার ঘটনা। কিন্তু তাতাইয়ের মা জানতেন না, সবসময় তাঁর ছেলে এই খেলাটা খেলেনা। যাদের তাতাই প্রচন্ড ভালবাসে, তারা আঘাত করলেই সে এমনটা করে, অথবা রূপকথার লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে যেতে গেলে সে তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এমন করে। বাবা বা মা - কেউই তাতাইয়ের বড় একটা প্রিয়পাত্র নয়। তাছাড়া তাতাই এদের রূপকথার চরিত্র হিসেবে ভাবতেও পারেনা। কারণ তাতাইয়ের স্বপ্নে কখনও ওর বাবা, মা আসেনি। আর স্বপ্নে যারা কখনও আসেনা, তাদের তাতাই রূপকথা ভাববে কী করে?

তাই খাটটা সেদিন নিশ্চিন্ত ছিল, আজ অন্তত তাতাই তার উপর কোনও জুলুম করবেনা। আর সত্যি সত্যিই সেদিন সেরকম কিছু ঘটলও না। বাড়ির বাকি লোকেরা ভয়ে ভয়ে ঘুমোতে গেল। সকালে উঠে নিশ্চিন্ত হল গতরাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

***

আজও একটা রবিবার, ছুটির দিন। আর দশটা রবিবারের সাথে অবশ্য আজ একটু তফাৎ আছে। আজ প্রায় বারো-তেরো বছর পর সম্পূর্ণ অকারণে ওদের বাড়িতে কোনও অতিথি আসবে। তাতাইদের বাড়িতে বড়ো একটা অনুষ্ঠান হয়না। হবার মধ্যে মিলির জন্মদিন, তাও সেসব নিচেই হয়। তাতাইয়ের কোনও অসুবিধা হয়না। কারণ ওকে নিচে যেতে হয়না। ওর ঠাকুমা মারা যাবার সময় শেষ কোনও বড় অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাতে অনেক লোক এসেছিলেন, ঘরেও থেকেছিলেন, কিন্তু তাতাই তখন খুব ছোট, তাই ভাল করে মনে নেই। শেষ কবছরে তেমন কিছু হয়নি। অবশ্য অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু তাতাই সেগুলো পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। ওর বাবা-মাও ওকে বড়ো একটা জোর করেনা।

আজ মিলির এক বান্ধবী আসবে। সারাদিন থাকবে, রাতে তার এই একান্ত নিজস্ব ঘরটার দখল নেবে।

পরদিন চলে যাবে। গতকাল রাতেই মিলি তাকে একথাটা জানিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে তাতাই সারারাত ঘুমোতে পারেনি। তাহলে কি রূপকথার দেশের লোকেরা মানুষের ছদ্মবেশে তাকে এই ঘর থেকে বের করে নিতে চাইছে?

ভীষণ চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে উঠল তাতাই। তাড়াতাড়ি মুখ, হাত ধুয়ে এসে কোনরকমে জলখাবার খেয়ে বসল জানলার কাছে। তারপর সেই ছোট ছেলেগুলোর ইঁট বওয়া দেখতে থাকল। গতকাল গুনেছিল মোট একশো সাতবার যাতায়াত করেছিল ওরা। আজ আবার গুনতে বসল।

এগারোবার গোনার শেষে দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হতে চমকে উঠল সে। তাকিয়ে দেখল মিলি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কিশোরী হাসি, পাশে মিলির বন্ধু।

- "দেখ দাদা, তোর সাথে আলাপ করতে এসেছে।"

মেয়েটিকে দেখেই চিনতে পারল সে, শেষবার যখন সে রূপকথার পাখিদের দেখেছিল, তখন রাজকন্যার বেশে এ ছিল। তাকে প্রায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছিল রূপকথার দেশে। অনেক কষ্টে সে পালিয়ে বেঁচেছিল।

- "তুমি কেন এসেছ এখানে? আমি যাব না তোমার সাথে" - চমকে উঠল মেয়েটি! মিলি হতভম্ব, তার সাধের বান্ধবী কীভাবে দাদাকে নিয়ে যাবে, আর কোথায়ই বা নিয়ে যাবে বুঝতে পারছিলনা প্রথমে। তারপরই কী মনে হতে হেসে উঠল। বন্ধু বৈজয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, আলতো করে বাঁ চোখটাও টিপল। বৈজয়ন্তী এবার খানিকটা বুঝতে পারে, মিলি ওর দাদার সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছে ওকে। তাই খানিকটা আঁচ করতে পারে। মিষ্টি হেসে বলার চেষ্টা করল - "আমি তোমায় কোথাও নিয়ে যেতে আসিনি, বন্ধুত্ব করতে এসেছি।" কিন্তু তাতাইয়ের চাহনি দেখে মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। ভীষণ অপ্রস্তুতে মিলির দিকে তাকাল, মিলি দ্রুত তার বান্ধবীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এমুহূর্তে ওর দাদাকে ঠিক ভরসা করতে পারছেনা।

বৈজয়ন্তী চলে গেলে আবার জানলার কাছে দাঁড়ায় তাতাই। তার চোখমুখ আবার শান্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি। আবার একটা ফাঁড়া কাটাতে পেরেছে সে। এখন অনেকটা সময় ওরা আর তাতাইকে ঘাঁটাবেনা। এই সময়টায় এই ভীষণ নিশ্চিন্ত, বিশ্লিষ্ট ঘরটায় থাকতে পারবে, একা, না - একা কেন? জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। দূরের মাঠটায় ছেলেগুলোকে দেখতে থাকল। ওইতো ওরা আছে ওর সাথে। কোনদিন হয়ত ওদের কাছে যেতে পারবেনা সে। তবু ওরাই ওর কাছের, ওর বন্ধু। একবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল তাতাই। ওর বোন বাবা-মাকে কী যেন বোঝাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে খিল এঁটে দিয়ে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। হাতে খাতা কলমটা তুলে নিল। আবার গুনতে শুরু করল - বারো, তেরো, চোদ্দ ... আজ আবার সারাদিন ধরে গুনবে সে। তাতাই জানে আজ তাকে এ ঘরটা ছেড়ে দিতে হবেই। হয়ত আর কিছুক্ষণ পরে বাবা-মা এসে দরজা ধাক্কাবে, চিৎকার করবে, বোঝাবে। কিন্তু এখন আর তাতাই দরজা খুলবেনা। সে একটা কাজ পেয়েছে, বোকা লোকেদের কাজ। সারাদিন ধরে করবে সেটা। তারপর সন্ধ্যে এলে, আকাশে যখন চাঁদ উঠবে-উঠবে, মাঠের উপর সেই আলো এসে পড়বে, তখন খুলে দেবে দরজা, রূপকথার রাজকন্যাকে ছেড়ে দেবে তার সাম্রাজ্য, বলে দেবে - নিয়ে যাও আমার রাজ্যটাকে আজ রাতের মত, কাল সকালে আবার আসব এর দখল নিতে।

বেড়ি ভাঙার শব্দ

কাহিনী - ঋত্বিক ঘটক
নাট্যরূপ - সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র - প্রশান্ত ও জয়া

(টাইটেল মিউজিক শেষ হবার পর মৃদু কোলাহল শোনা যায়। টেবিলে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ ও গম্ভীর কণ্ঠে 'সাইলেন্স, সাইলেন্স' উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল থেমে যায়। শোনা যায় প্রশান্তর কণ্ঠ -)

প্রশান্ত।। ইওর অনার, আমি জানি আমি আইনের চোখে অপরাধী। সেজন্যেই তো স্বেচ্ছায় কোর্টে সারেন্ডার করেছি। কিন্তু মহামান্য বিচারকের কাছে আমার একটাই আর্জি, কেন করেছি ঐ অপরাধ? কেন? সেটা বিচার করার জন্যে অনুগ্রহ করে আমার এজাহারটা পড়ে দেখুন।

(কোলাহল - 'এজাহার, এজাহার'। মিউজিক আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।)

প্রশান্ত ।। কে?

জয়া ।। চমকে উঠলে যে?

প্রশান্ত ।। একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ তোর ঠান্ডা হাতের ছোঁয়ায় -

জয়া ।। কী ভাবছিলে?

প্রশান্ত ।। তোর বাড়িতে এসে যা দেখলাম -

জয়া ।। ওসব নিয়ে ভেব না, দুঃখ পাবে।

প্রশান্ত ।। দুঃখ নয় জয়া! ক্ষোভ! বুকের মধ্যে সমস্ত রক্ত তোলপাড় করা ক্ষোভের ঘুণপোকা আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। অথচ তুই -

জয়া ।। বাবার কাছে শিক্ষা আমার, তাঁর কাছেই শিখেছি কেমন করে মনকে সংযত করতে হয়।

প্রশান্ত ।। ওটা হল আত্মপ্রবঞ্চনা। ওতে কী ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তা জানিনা, তবে তা যে মানুষকে পাথরের মত ঘুম পাড়িয়ে রাখে তার একটা উদাহরণ হচ্ছিস তুই।

জয়া ।। দাদা !

প্রশান্ত ।। জয়া, প্রাচীন শাস্ত্রের নীতিশিক্ষা নিয়ে আমার বাবার মতো যারা বড়াই করে তাদের আন্দামান-আফ্রিকার বনেজঙ্গলে কিংবা জনবসতিহীন পাহাড় পর্বতে আস্তানা খুঁজে নেওয়া উচিত।

জয়া ।। তুমি কি এখনও সেই রাগ-অভিমান পুষে রেখেছ?

প্রশান্ত ।। অভিমান নয়, প্রতিবাদ। সে জন্যই তোর বিয়ের আগে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি তারপর আর ঢুকিনি। কারণ আমার চোখে এক চল্লিশোর্ধ দোজবরের হাতে ষোলো-সতেরো বছরের কন্যাদান আসলে বলিদান।

জয়া ।। এসব কথা থাক।

প্রশান্ত ।। কেন? থাকবে কেন? তুই অস্বীকার করতে পারিস? আর অস্বীকার করলেও কিছু

যায় আসে না। এখানে এসে যা দেখেছি, যা শুনেছি -

জয়া ।। যেমন?

প্রশান্ত ।। যেমন তোর শাশুড়ি - দিনরাত মালা জপছেন, মন্দিরে ঠাকুর আগলে হা-পিত্যেশ করছেন - দেবদেবীর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য, অথচ তিনি কাল সকালে কলতলায় -

(দৃশ্যান্তর। মিউজিক।)

(নেপথ্য) শাশুড়ি।। হতচ্ছাড়ি মাগি। তোর বড্ড বাড় বেড়েছে। ভাইকে দেখে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? বলি ওটা তোর ভাই না ভাতার?

(নেপথ্য) জয়া ।। মা!!

(নেপথ্য) শাশুড়ি।। যাক! আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। তোর বাপ আমাদের অচল পয়সা দিয়ে ঠকিয়েছে। যত্তোসব ছোটলোকের বংশ। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার -

(মিউজিক)

প্রশান্ত ।। এরপরেও তুই বলতে চাস -

জয়া ।। বয়েস হয়েছে, আর কদিনই বা বাঁচবেন?

প্রশান্ত ।। কিন্তু চৌধুরিবাবু? একটা মদ্যপ, লম্পট -

জয়া ।। কিন্তু তিনি আমার স্বামী।

প্রশান্ত ।। তাহলে উত্তর দে, তোর শরীরে এগুলো কীসের দাগ? কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে এমন নির্মমভাবে ঠেঙাতে পারে? উঃ! কী পৈশাচিক!

জয়া ।। সবই আমার ভাগ্য।

প্রশান্ত ।। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কেন সত্যকে আড়াল করতে চাইছিস? আমি বারবার বলেছিলাম তেজারতি ব্যবসায় যে অর্থবল, আমার বাবার কাছে তা ভগবানের দান মনে হলেও আমার চোখে সে নরকের নেড়িকুত্তার সমান।

জয়া ।। চুপ করো দাদা! তুমি চুপ করো! (কেঁদে ফেলে)

প্রশান্ত ।। তুই কাঁদছিস? বিশ্বাস কর, এই অন্ধকার কারাগারে বন্দি জয়াকে আমি দেখতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম -

জয়া ।। সব চাওয়াই তো আর পাওয়া যায়না দাদা।

প্রশান্ত ।। জানি, তবু আমি আশা করেছিলাম আমার ধারণাগুলো অন্তত কিছুটা মিথ্যে হবে।

জয়া ।। কিন্তু যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

প্রশান্ত ।। সেজন্যেই তো মনটা মাঝেমাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিছুতেই তাকে আমি বশ মানাতে পারিনা।

জয়া ।। তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?

প্রশান্ত ।। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য এই কর্দম-কুৎসিত নরক একটা মানুষ কতদিন মেনে নিতে পারে?

জয়া ।। এছাড়া উপায় কী?

প্রশান্ত ।। সেজন্যই তো আফসোস হয়।

জয়া ।। কেন?

প্রশান্ত ।। যাঁর প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন জেনেশুনেও তাঁর সঙ্গে তোর বিয়েটা আমি

আটকাতে পারিনি।

জয়া ।। উনি উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

প্রশান্ত ।। তাঁর উন্মাদনার কারণটা এখন নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিস?

জয়া ।। আমি কিন্তু এখনও তা হইনি।

প্রশান্ত ।। সেজন্যই তো তোকে আমার জড়পদার্থ মনে হয়।

জয়া ।। তুমি কি তাতে খুশি হতে?

প্রশান্ত ।। আমার খুশি-অখুশির বিষয় এটা নয়। যেখানে যা স্বাভাবিক আমি সেটাই বলছি।

জয়া ।। কিন্তু স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের ওই ফর্মুলা তো সবসময় সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

প্রশান্ত ।। তা ঠিক। তবে ব্যতিক্রম সবসময় বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

জয়া ।। আমাকে তুমি সেই ব্যতিক্রম ভাবতে পারছো না কেন?

প্রশান্ত ।। যা ভাবছি তা বাবাকেই বলব।

জয়া ।। বাবাকে এসব কিছু বোলোনা।

প্রশান্ত ।। কী বলব?

জয়া ।। বোলো, আমি ভাল আছি।

প্রশান্ত ।। জয়া।

জয়া ।। কেন এলে তুমি এখানে? কেন?

প্রশান্ত ।। পারিনা, কিছুতেই ভুলতে পারিনা। ছোটবেলার সেই সুখ-স্মৃতি-স্বপ্ন। (মিউজিক) শৈশবে মাকে হারিয়েছি। একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি পিঠোপিঠি আমরা দুই ভাইবোন। বিশ্বাস কর জয়া মায়ের মুখের সেই হাসি, সেই চলা-বলা-ভঙ্গিমা - কিছুটা ফিরে পেয়েছিলাম তোর কাছ থেকে।

জয়া ।। দাদা!!

প্রশান্ত ।। হ্যাঁ জয়া, কোজাগরি পূর্ণিমার মত সেই অপরূপ রূপ, যা দেখে ওই শয়তানটা তোকে বিয়ে করে নিয়ে এল - কিন্তু বলতে পারিস, কোথায় গেল তোর সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত হাসি? ফুলের মত তরতাজা সেই শরীরটা আজ কেন এমন বিবর্ণ? গর্তে হারিয়ে যাওয়া চোখ থেকে ঝরে পড়া অশ্রুর ধাক্কায় এ দগ্‌দগে ঘা কীসের ইঙ্গিত?

জয়া ।। জানিনা, এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানিনা।

প্রশান্ত ।। কেন এড়িয়ে যাচ্ছিস?

জয়া ।। বারবার আমাকে কেন তুমি আঘাত করছ?

প্রশান্ত ।। কারণ, ক্ষোভে-দুঃখে-যন্ত্রণায় আমি এখন অস্থির মাতালের মতো দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য। আমার বিবেক, আমার অনুভূতি সর্বদাই আমাকে চাবুক মারে। নির্মম চাবুক। উঃ! অসহ্য! কী ভয়ংকর যন্ত্রণা -

জয়া ।। দাদা! এসব কথা এখন থাক না!

(ঘড়িতে ঘন্টা বেজে ওঠে)

প্রশান্ত ।। জয়া, সময়টা দুপুর পেরিয়ে বিকেলে চলে এল। আরেকটু পরেই আজকের দিনটা শেষ। বাকি শুধু রাত্তিরটা। কাল সকালেই তো চলে যাব।

জয়া ।। আবার কবে আসবে?

প্রশান্ত ।। জানিনা।

জয়া ।। তুমি মাঝেমধ্যে এলে আমার ভাল লাগে।

প্রশান্ত ।। চৌধুরিবাবু কখন ফিরবেন?

জয়া ।। ওর ফিরতে ফিরতে কাল বিকেল। মাঝেমধ্যেই ব্যবসার কাজে ওকে বাইরে যেতে হয়।

প্রশান্ত ।। এতবড় বাড়িতে একা থাকতে তোর ভয় করেনা?

জয়া ।। অভ্যেস হয়ে গেছে।

প্রশান্ত ।। আজ তোর শাশুড়িকে দেখছি না?

জয়া ।। আগামীকাল সকালে ফিরবেন।

প্রশান্ত ।। গেছে কোথায়?

জয়া ।। পাশের গাঁয়ে - মেয়ের বাড়ি। বেশি দূর না, কিন্তু রাস্তা খারাপ। সন্ধ্যে হতে না হতেই রাতের অন্ধকার জাঁকিয়ে বসে।

প্রশান্ত ।। তোর মনে আছে জয়া, আমাদেব বাড়ির সামনে সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে পথ চলার কষ্ট? তুই বলতিস -

(মিউজিক। দৃশ্যান্তর।)

জয়া ।। দাদা, মানুষের সবদিন সমান যায়না।

প্রশান্ত ।। বলছিস?

জয়া ।। অবশ্যই। তুই ডাক্তারি পাস করে চাকরি পেলেই আমরা নতুন জায়গায় চলে যাব।

প্রশান্ত ।। নতুন জায়গা?

জয়া ।। কোনও পাহাড়ি এলাকায়, জঙ্গলের কাছ বরাবর লোকালয়ে যদি তোর পোস্টিং হয় তাহলে দারুণ মজা হবে।

প্রশান্ত ।। কীরকম?

জয়া ।। সরকারি বাংলোর অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখব দূরে পাহাড়ি নদীর বিছানায় ঘুমন্ত চাঁদ কীভাবে সান্ধ্যসঙ্গীতের স্রোতে জেগে ওঠে।

প্রশান্ত ।। আর তখন জমাটবাঁধা আঁধারের স্তূপে গাছের পাতায়-পাতায়, শাখাপ্রশাখায়, ফুলে-ফলে অজস্র আলোর ইন্দ্রধনু।

জয়া ।। আমাদের বাড়ির সামনে থাকবে মেহেদির বেড়া দেওয়া ছোট্ট বাগান।

প্রশান্ত ।। আর বাগানের পাশেই উঁচুনিচু কাঁকরের লাল মাটির রাস্তা।

জয়া ।। সত্যি কী দারুণ! চারধারে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল।

প্রশান্ত ।। পাশে পাহাড়ি ঝর্ণার স্বর্গীয় মূর্চ্ছনা।

জয়া ।। আর নদীর ঝিরঝিরে বাতাসের তালে সবুজ শস্যের ধ্রুপদী নৃত্য।

প্রশান্ত ।। মাথার উপর নীল আকাশ।

জয়া ।। টুকরো-টুকরো মেঘের আভাস।

প্রশান্ত ।। গাড়িতে এখানে সেখানে ঘোরা।

জয়া ।। ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচা।

প্রশান্ত ।। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে সুরের ভজনা।

জয়া ।। দাদা! তুই কথা দে! ঠিক এমনই একটা জায়গায় আমরা চলে যাব! যেখানে প্রকৃতির কোলে, লোকালয়ে, শুধু মানুষ, মানুষের মত মানুষ।

প্রশান্ত ।। ঐ মানুষের সাথেই সারাদিন শুধু কাজ।

জয়া ।। কাজের শেষে?

প্রশান্ত ।। নাচ আর গান।

জয়া ।। তারপর?

প্রশান্ত ।। বিশ্রাম। নিশ্চিন্ত - নিরুদ্বেগ বিশ্রাম।

কোরাস।। তারপর আবার কাজ, আবার আনন্দ, আবার বিশ্রাম -

(আস্তে আস্তে কোরাস মিলিয়ে যায়। দৃশ্যান্তর। মিউজিক)

জয়া ।। দাদা!

প্রশান্ত ।। হুঁ!

জয়া ।। কী ভাবছো?

প্রশান্ত ।। চাকরি আমি পেয়েছি। কিন্তু আমাদের সেই স্বপ্নের লোকালয় আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জয়া ।। যা স্বপ্ন, তা তো স্বপ্নই। তা কি কখনও খুঁজে পাওয়া যায়?

প্রশান্ত ।। সব স্বপ্নই মিথ্যে নয়। স্বপ্নের রঙীন ডানায় ভর করেই তো জীবন ফুলের পাপড়ির মত নিজেকে মেলে ধরে। আচ্ছা জয়া! তুই কি এখন ঐ স্বপ্ন দেখার জন্য একটু সাহসী হতে পারিসনা?

জয়া ।। স্বপ্ন!

প্রশান্ত ।। হ্যাঁ, স্বপ্ন। এই অন্ধকার বর্তমানকে সাঁতরে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পারে পৌঁছবার স্বপ্ন!

জয়া ।। কিন্তু কীভাবে?

প্রশান্ত ।। এখনও সময় আছে। তুই আমার সঙ্গে চল। আমার ওখানে থাকবি।

জয়া ।। তা হয়না।

প্রশান্ত ।। কেন হয়না?

জয়া ।। যার হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর, তার কাছে শ্বশুরের ভিটে একমাত্র সম্বল।

প্রশান্ত ।। এইসব শাস্ত্রবিধি আসলে মেয়েদের চিরকাল ক্রীতদাসী করে রাখার ফন্দিফিকির।

জয়া ।। কিন্তু সমাজ তো এগুলোকে নিয়ম বলে মেনে নিয়েছে।

প্রশান্ত ।। কারণ, কোনও না কোনও ভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাই এই মেনে নেওয়াটা এখন একধরনের অভ্যেস। তবে এই বদ অভ্যেসের প্রাচীরে অজস্র ফাটল দেখা দিয়েছে। সেখানে চোখ রাখ, তাহলেই স্পষ্ট দেখতে পাবি, হাজার হাজার বছর ধরে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সমাজে শুধুমাত্র নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কীভাবে মানুষকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। পাশাপাশি ওই শেকল ভাঙ্গার কাজটাও কে বা কারা কীভাবে করে চলেছে। আয় জয়া, আমার কাছে আয়। আমি তোর হাতে-পায়ে ওই প্রাচীন শাস্ত্রীয় বেড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলতে সাহায্য করব।

জয়া ।। কিন্তু আমার বৃদ্ধা শাশুড়ি আর অসুস্থ স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব?

প্রশান্ত ।। অবশ্যই সম্ভব। কারণ, ওদুটি জীবন প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির নিভু নিভু সলতে।

জয়া ।। দাদা! ভুলে যেওনা তুমি ডাক্তার। মুমূর্ষকে জীবনদান করাটাই তোমার কাজ।

প্রশান্ত ।। ঠিক কথা। কিন্তু শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য একে কোনওমতে জ্বালিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়।

জয়া ।। দাদা!

প্রশান্ত ।। হ্যাঁ, জয়া। আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শত-সহস্র টাটকা জীবন অপেক্ষা করছে একটু সেবা-শুশ্রূষার জন্য। চল, দু-ভাইবোনে তাদের কাছে যাই।

জয়া ।। যেতে পারলে আমি হয়তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু আমার কপালে ভাগ্যদেবীর যা লিখন, তা তো মেনে নিতেই হয়। তাই আমার স্বামীর এই ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছেনা।

প্রশান্ত ।। এমন ভয়ংকর মিথ্যে সংস্কারের অন্ধকূপে তোরই মত অজস্র জীবন একটা আলোর রেখার জন্য ছটফট করছে। জয়া! তুই তাদের আলো দেখা।

জয়া ।। আমি সেকাজে অক্ষম।

প্রশান্ত ।। কেন?

জয়া ।। আমার স্বামী এখনও জীবিত। তাই তাঁর নির্দেশই আমার কাছে বেদবাক্য।

প্রশান্ত ।। তাহলে তো শেষমেষ চৌধুরিবাবুকেই মেরে ফেলতে হয়।

জয়া ।। এটা কী বলছো তুমি?

প্রশান্ত ।। ঠিকই বলছি। জীবনের বুকে উর্বর পলিমাটির জন্য অমন রক্তপাতের দরকার হয়।

জয়া ।। তার মানে এই নরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য তুমি আমাকে বৈধব্যের শৃঙ্খলে বাঁধতে চাও?

প্রশান্ত ।। না, না, তা কেন? আমি বলছিলাম -

জয়া ।। ছিঃ! এমন কথা তুমি বলতে পারলে?

প্রশান্ত ।। সত্যি কথা বলতে কী - ওই জানোয়ারটার কথা ভাবলেই -

জয়া ।। দাদা! আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার তোমার নেই।

প্রশান্ত ।। আছে জয়া, আছে।

জয়া ।। না, নেই! আমি যাঁকে মেনে নিয়েছি -

প্রশান্ত ।। মেনে নিয়েছিস? যে লোকটা দিনের পর দিন পতিতাপল্লীতে রাত্রিযাপন করে, বিয়ে করা বৌকে যে পরিচারিকার মর্যাদাটুকুও দিতে রাজি নয়, তাকে মেনে নিতে তোর রুচিতে বাধেনা?

জয়া ।। আমি গর্ভবতী। ওর সন্তান আমার পেটে।

প্রশান্ত ।। সন্তান নয়! বল, ওর রোগের জীবাণু তোর শরীরে।

জয়া ।। কী বলছো তুমি?

প্রশান্ত ।। জয়া! আমি একজন ডাক্তার। তাই নির্মম হলেও সত্য কথাটা বলতেই হয়। তুই জেনে রাখ, সুস্থসবল সন্তানের মা হবার সম্ভাবনা তোর নেই!

জয়া ।। দাদা! (কঁকিয়ে ওঠে)

প্রশান্ত ।। জানি, খুবই দুঃখজনক। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ অবস্থায় এক বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেওয়া ছাড়া এ পৃথিবীকে তুই আর কিছু দিতে পারবি না।

জয়া ।। এমন নিষ্ঠুর কথাটা তুমি বলতে পারলে?

প্রশান্ত ।। হ্যাঁ, পারলাম! কারণ ওকে পরীক্ষা করে আমি যা বুঝেছি -
জয়া ।। কী বুঝেছো?
প্রশান্ত ।। চৌধুরিবাবু অতি মারাত্মক এক যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত!
জয়া ।। দাদা!! (আর্তনাদ) (মিউজিক)
প্রশান্ত ।। বাঁচবিনা! তোরা কেউ বাঁচবিনা! তুই না, চৌধুরিবাবু না, কেউ না!
জয়া ।। (কেঁদে ফেলে) এসব কথা তুমি কেন বলছ দাদা! কেন?
প্রশান্ত ।। কারণ আমার বুকের মধ্যে আমার ভালোবাসার মৃত্যুযন্ত্রণা বড় অসহ্য!
জয়া ।। তাহলে উপায়?
প্রশান্ত ।। তোকে বাঁচাতে একবার শেষ চেষ্টা করার জন্যই বলেছিলাম -
জয়া ।। তোমার ওই প্রস্তাব মেনে নেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।
প্রশান্ত ।। তাহলে আমি নিরুপায়।
জয়া ।। এ প্রসঙ্গটা থাক!
প্রশান্ত ।। বেশ থাক!
জয়া ।। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখ!
প্রশান্ত ।। কী?
জয়া ।। কেমন চাঁদ উঠেছে।
প্রশান্ত ।। হ্যাঁ, চাঁদ উঠেছে।
জয়া ।। চাঁদের আলোর বন্যায় চারধার ভাসছে।
প্রশান্ত ।। আর এই ঘরটা কেমন যেন হেলছে, দুলছে, কাঁপছে।
(জয়া গান ধরে -
এত বড় আকাশটাকে ধরলে জোছনায়, ওগো চাঁদ তোমায় বোঝা ভার)
জয়া ।। চল না, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি
প্রশান্ত ।। ভালো লাগছে না।
জয়া ।। তোমার মনে আছে দাদা, পূর্ণিমার রাতে আমাদের বাড়ির উঠোনে -
প্রশান্ত ।। তুই আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তিস।
জয়া ।। তুমি আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে গল্প শোনাতে। কতরকম গল্প।
প্রশান্ত ।। তখন তুই কিশোরী।
জয়া ।। আজও তেমন ইচ্ছে করছে।
প্রশান্ত ।। তাই?
জয়া ।। সত্যি বলছি।
প্রশান্ত ।। তাহলে কাছে আয়। আঃ! কী ভালো লাগছে!
জয়া ।। সেই ছোট্টবেলার কথা মনে পড়ছে।
প্রশান্ত ।। আমারও! যেন বহুদিন পর ফিরে পেয়েছি, আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বোন।
জয়া ।। দাদা!
প্রশান্ত ।। কিন্তু তোর চুলগুলো এমন রুক্ষ কেন?
জয়া ।। অনেকদিন মাথায় তেল পড়েনি।
প্রশান্ত ।। এখান থেকে আকাশ দেখতে পাচ্ছিস?

জয়া ।। পারছি দাদা।

প্রশান্ত ।। আকাশের বুকে ঝকমকে তারার আলো, আমাদের সেই স্বপ্নের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস?

জয়া ।। হুঁ!

প্রশান্ত ।। ঘুমিয়ে পড়লি?

জয়া ।। উঁ-হুঁ!

প্রশান্ত ।। একসময় তোর গাওয়া গানের কলি মনে পড়ছে। সত্যি! তোর এই গলায় কি চমৎকার সুরই না খেলা করত! আর এখন?

(প্রশান্ত যেন হঠাৎ জয়ার গলা চেপে ধরে। জয়ার বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা। ছড়িয়ে পড়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ। মিউজিক)

প্রশান্ত ।। হ্যাঁ, মি লর্ড! জয়ার গলাটা এত নরম, সামান্য চাপ দিতেই আঙুলগুলো বসে গেল। না - না! ও আমার উদ্দেশ্য একদম বুঝতে পারেনি। তবুও শেষমুহূর্তে সজোরে আমার হাত চেপে ধরেছিল। বাঁচার শেষ চেষ্টা। এই দেখুন, আমার হাতে ওর বসে যাওয়া নখের ক্ষতস্থান! এখান থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত দিয়েই ওর সীমন্তের সিঁদুর মুছিয়ে দিয়েছি। একি! আমার দিকে অমন বিস্ফারিত চোখে ওরা তাকিয়ে আছে কেন? (চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ) কী বলতে চান আপ-না-রা? ইওর অনার! এজলাসে যার দিকেই তাকাচ্ছি, তার মুখে আমি জয়ার সেই বীভৎস মুখটা দেখতে পাচ্ছি কেন? প্লিজ জয়া! আমায় যেতে দে! পথ ছাড় বলছি! হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, আবার আসব। তখন নিশ্চয়ই খুঁজে আনব সেই মনোরম স্বপ্নসবুজ বাড়ির ঠিকানা। জয়া - (হাহাকার করে ওঠে। মিউজিক)

(সমাপ্ত)

ম্যাকশৈশব এবং ফেলে আসা ভোরবেলা

সুব্রত সেনশর্মা

"আমি কোরিয়ার কাংগুং প্রদেশে একটা হোগওয়ানে (প্রাইভেট আকাদেমিতে) ইংরেজি পড়াই। আমার চাকরির জায়গার সমালোচনা করতে চাইনা, কিন্তু অনুভব করি যে একটা সমস্যার ব্যাপারে সত্যিই কিছু বলা দরকার। এটা যে শুধু কোরিয়ার সমস্যা তা নয়। আমি জাপানে পড়াতে গিয়েও একই ঘটনা দেখেছি, আর একই ঘটনা ঘটছে আমার মাতৃভূমি আমেরিকায়। তবে আমার মনে হয় যে এশিয়ার সমাজে এটা অনেক বেশি প্রকট। এই সমস্যাটা হল হারানো শৈশবের। মনে হয় যেন গোটা সমাজ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে শৈশব হলো একটা অবান্তর বাড়াবাড়ি আর সময়ের অপচয়। কোরিয়াতে প্রতিযোগিতা জিনিসটা একটা সামাজিক ব্যাধির মতন, বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরও এর থেকে নিস্তার নেই। বাবা-মায়েরা জীবনের সাফল্য সম্পর্কে নিজেদের মনে যা ধারণা তৈরী করেছেন, তাই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদে ক্ষুদে মস্তিষ্কে। মাস্টার প্ল্যানটা মোটামুটি এইরকম : যতো কম বয়সে পারো স্কুলে ঢুকিয়ে দাও, পাতে ঢেলে দাও হোমওয়ার্ক, কেড়ে নাও অহেতুক খেলনাবাটি, আঁকজোক আর যত্তো বাজে সময় কাটানোর উপকরণ। সপ্তাহে ছয়দিন স্কুলে পাঠাও, আর অবসর সময়ে পাঠিয়ে দাও হোগওয়ানে।" (কোরিয়া ডেইলিতে ১৯৯৬-এর অক্টোবরে প্রকাশিত জনৈক এ. বারেসের লেখা প্রবন্ধ থেকে)

আধুনিক সভ্যতার এক মহান অবদান হল ওয়াশিং মেশিন। নোংরা, দলাপাকানো জামাকাপড় ঢুকিয়ে দাও, ঢেলে দাও পরিমাণমতো সাবান, টিপে দাও বোতাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা, আর তার পরেই বেরিয়ে আসে মনোমতন সাফসুতরো কাপড় চোপড়। আজকের শৈশব হচ্ছে এমনই একটা ওয়াশিং সিস্টেম। কাঁচা, অপরিপক্ক মাথাগুলোকে ধরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর কয়েকবছর অপেক্ষার পর বাবা-মা পেয়ে যাচ্ছেন ঝকঝকে, 'যেমনটা চাই' ছেলেমেয়ে। আমাদের সমাজ ডিজাইনার ভ্রূণ নিয়ে হাজার ধন্ধে আছে, কিন্তু আমরা এখনই পেয়ে গেছি ডিজাইনার শৈশব। এই শৈশব অহেতুক নয়, অবান্তর নয়। একটা নির্দিষ্ট লক্ষে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়াটাই এই শৈশবের কাজ। খুশি বাবা-মা, খুশি শিক্ষক, খুশি সমাজ। মাস্টার প্ল্যান মাফিক বানানো এইসব রোবট এরপর নেমে পড়বে উন্নততর সমাজ বানানোর কাজে। বেঞ্জামিন বার্বারের বর্ণিত ম্যাকবিশ্বের নাগরিক এই সুসন্তানদের ভিড়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে হাকলবেরী ফিন, টম সয়্যার, শ্রীকান্তের দল। জন্ম হয়েছে ম্যাকশৈশবের।

ভোরবেলার কথা

সময়টা ঠিক মনে নেই। উনসত্তর কি সত্তর হবে। এইসময় একদিন রেলস্টেশনের কেবিনের গায়ে লাগানো খবরের কাগজে দেখলাম হেডলাইন পড়েছে ঃ সত্তরের দশক, মুক্তির দশক। সেদিন মানে বুঝিনি, আজও বুঝি কি না জানিনা। তবে অনেকের সাথে আমারও শৈশব শেষ করে কৈশোরের দিকে পা বাড়ানোর সময় তখন। প্রাইমারি স্কুল শেষ করে সেকেন্ডারিতে যাতায়াত চলছে। শহরতলি থেকে কলকাতার স্কুলে পড়তে যেতাম, সুতরাং ভোরের ট্রেন থেকে অফিস টাইমের কুস্তিতে প্রমোশন ঘটে গিয়েছে ততদিনে।

ছোটবেলার দিনের ভাগ ছিল বড়ো স্পষ্ট। দিনের মধ্যে সবথেকে অলৌকিক সময় ছিল ভোরবেলা। শহরতলিতে আমরা যারা বড় হয়েছি তারা জানি যে গ্রাম আর শহরে মেশানো এক অদ্ভুত জগৎ সেখানে। আজকের শহরতলি বড়ো শহরঘেঁষা। বরং আমেরিকার সাবার্বিয়ার সাথে মেলে ভালো।

এই শহরতলি ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যেত ভোরবেলা, মাঝদুপুরে আর রাতেরবেলা। রাত আর দুপুর আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই ভোরের স্মৃতি এত বর্ণময়। একবার ভোর কেটে সকালবেলা হয়ে গেলেই হালকা আমেজ উধাও। মিলের ভোঁ, বাসের ধমক, ট্রেনের অবিরাম আসা যাওয়া, অফিসযাত্রীর মিছিল ইত্যাদি সব মিলিয়ে একটা শহর-শহর অস্থিরতা। দিনেরবেলা মানেই একটা সাবালকতা, মাথা ঝুঁকিয়ে গম্ভীরভাবে হাঁটাহাটি করার সময়। আমাদের মতন নাবালকরা তখন মানে-মানে স্কুলে কেটে পড়তে পারলে বাঁচে।

ভোরবেলার জীবনে ছিল নানারকম চরিত্র। প্রথমে সারমেয়কুল দিয়ে শুরু করি। গভীররাতে এদের ব্যবহার কীরকম, তা অনেক গুণীজন লিখে গিয়েছেন। ভোরবেলাতে এদের কাজকর্ম ছিল বিবিধ। দল বেঁধে থাকা কুকুরদের মধ্যে অনেককে দেখা যেত সবসময় দাঁড়িয়ে থাকতে। পাড়ার বড়রা এদেরকে 'স্ট্যান্ডিং কমিটি মেম্বার' বলত। অনেককে সর্বদাই বসে কাটাতে দেখা যেত। নেহাত চারদিকে খুব হাঁকডাক শুরু না হলে এরা তাকিয়া ছেড়ে উঠত না। স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বারদের খুবই ঘোরাফেরা করতে দেখতাম। এদেরকে দেখে একটা সংগঠিত শক্তি বলে মনে হত কেন জানিনা। আমরা ভোরবেলা উঠে দৌড় ইত্যাদি শুরু করলে এরাও আমাদের সাথে থাকত। মানুষের বিশেষ বন্ধু বলে কথা। তবে এদের মনটা ভালো হলেও, শরীরের দিকে তাকালে বড়ো ভয় হত। দগদগে ঘা, কোথাও গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে উঠে যাওয়া চামড়ার তলা দিয়ে উঁকি মারা মাংসপিণ্ড, এলাকা দখলের লড়াইয়ে হারিয়ে যাওয়া ল্যাজ। এসব মিলিয়ে একটা দাগী সমাজবিরোধী প্রোফাইল। তাকিয়া বাবুদের অনেকেরই মুখের চারপাশে ঘা। পাড়ার অনেকের বাড়িতেই কুকুর ছিল, তবে কাউকে দেশি কুকুর পুষতে দেখিনি। আমরাও একইরকম ছিলাম। এর বহুবিধ কারণ থাকতে পারে, সেসব এই লেখার বিষয় নয়। দেশি আর বিদেশির সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ ছিলনা। তবে ভোররাতে চুরি করতে আসা নতুন চোরেরা অনেকসময় সারমেয়কুলের ডাকাডাকিতে ধরা পড়ত। আজ মনে হয় এই কুকুরগুলোকে ঠিকঠাক ট্রেনিং দিলে এরা এদেশের ড্রাগ এনফোর্সমেন্টে কাজ করতে পারত। কে জানে হয়ত ভারতের 'বডি-শপিং' (প্রফেসনাল এক্সপোর্ট) ব্যবসাতে মুনাফা এনে এরাও হয়ে উঠত হিরো।

সারমেয় প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার অন্যদিকে আসা যাক। পাড়ার দাদু দিদিমারা ছিলেন ভোরের ডেমোগ্রাফিতে মেজরিটি। দাদাদের কাছ থেকে সবসময় শুনতাম যে ভেজালের জন্যই আজ আমাদের জাত এত দুর্বল। আর আগের জেনারেশন ব্রিটিশ আমলের খাঁটি দুধ খেয়ে বড়। তাই তারা সাহেবদের সঙ্গে লড়তে পেরেছে। এই শ্রুতি প্রায় বেদের শক্তি ধারণ করত যখন দাদুদের কাকভোরে মর্নিং ওয়াকে বেরোতে দেখতাম। বাবুরা বিছানাতে আর তাদের বাবারা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

যাই হোক, কয়েকটা মজার ঘটনার কথা বলি। দুধের প্রসঙ্গেই থাকা যাক। আমরা অনেকেই ভোরবেলা উঠে গয়লাবাড়ি যেতাম দুধ আনতে। বাড়িতে বিশ্বাস ছিল যে সরাসরি গরুর বাঁট থেকে পাওয়া দুধে ভেজাল কম থাকবে, দুধ বেশি থাকবে ইত্যাদি। তা যখন সেই দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বোঝা গেল যে ব্রিটিশরা আর গোয়ালেও নেই, তখন নির্দেশ এল গয়লার হাতের দিকে নজর রাখতে হবে, ওখানেই কারসাজি। একেই ভোরের আলো-আঁধারি, তার উপরে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা চোখ। তা সত্ত্বেও আমরা ছেলেবুড়োর দল ভোরবেলায় গয়লা আর তার গরুকে ঘিরে ফেলে বাঁটের দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। এসব ছিল ভোরবেলার জীবনের অনবদ্য উপাখ্যান। পরে শুনেছিলাম গরুর খড় আর খাবারের মধ্যেই আছে রহস্য! এর কোনও প্রমাণ নেই কোথাও।

এরপর বলতে হয় গান-বাজনার কথা। শহরের কথা জানিনা, তবে আমাদের শহরতলিতে পাড়ায়-পাড়ায় ভোরবেলায় রীতিমতো অর্কেস্ট্রা বসে যেত। মনের উপর ভোরবেলার নানারকম প্রভাবের কথা শুনেছি, তবে কী কারণে এতো মানুষ গলা ছেড়ে গান ধরার সাহস পেত তা সত্যিই গবেষণার

বিষয়। আবার কোনও কোনও বাড়ি থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চচ্চড়ি পরিবেশিত হত। আজও তার কথা ভাবলে চমকে উঠি। দোলের দিন ভোরবেলা পাড়ার বয়োবৃদ্ধরা দল বেঁধে ঢোল-করতাল সহযোগে গান গাইতে গাইতে দু তিন পাড়া ঘুরতেন। বেশ অন্যরকম লাগত সেই সকালবেলাটা।

মজার ঘটনায় ফিরে আসি। আমরা প্রায়শই দল বেঁধে কাছে পিঠের মাঠে ভোরবেলায় দৌড়-ঝাঁপ করতে যেতাম। পথে একটু হৈ হল্লা হত। মোটামুটি সকলেই এটাকে বাদবাকি আওয়াজের সাথে মিলিয়ে মাফ করে দিতেন। কিন্তু দু একজন সহজে ছাড়তেন না। এরকমই একজন (ধরুন জগাদা) কোন একদিন আমাদের রাস্তাতে দাঁড় করিয়ে একথা সেকথা শোনাতে শুরু করলেন। শহরতলিটা পুরো শহর নয়, পাড়ার যে কোনও দাদা যে কোনও ছোটকে বকে দিতে পারতেন। আমাদের মধ্যে বিলু বরাবরই পাকা, সে জগাদাকে বলে বসল, "মেসোমশাই, আপনি সব ছেড়ে দিন। আমি সব দেখে নেবো"। জগাদার তখন বিয়ে হয়নি, মাসিরই পাত্তা নেই, তার মেসোমশাই! জগাদা দরজার খিল খুলে আনে আর কি। সে ঘটনার মিটমাট হয়ে গেলেও জগাদা মাসি বিনা মেসোমশাই রয়ে গেলেন। জগাদার বিয়ের সময়টা পাড়ার চ্যাংড়াদের কাছে উপাদেয় ছিল।

প্রাতঃকালের কথা বলতে বসে প্রাতঃকৃত্য নিয়ে কথা না হলে একটা অপূর্ণতা থেকে যাবে। একদিন ভোরে পাড়ার প্রেসে মাখনবাবুর চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকজন জড়ো হয় গেল। ঘটনাটা এই যে মাখনবাবু যে ছেলেটিকে রেখেছিলেন প্রেসে রাতে থাকার জন্য, সে বাড়ি যাবার সময় কোনও কারণে আর ধরে রাখতে না পেরে প্রেসের সামনে নিজেকে হালকা করেছে। অনেকে বললেন যে ও-ই করেছে তার প্রমাণ কী? যে ভিতরে ছিল সে কেন বাইরে আসতে যাবে? আর খুনের অপরাধী ধরার জন্য না হয় রক্ত শোঁকা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে? যাই হোক, এর থেকে দুটো ঘটনা ঘটল। এক, দোকানঘরের মালিক একটা বাথরুম করে দিলেন আর দুই, প্রতিবাদের প্রকরণ হিসেবে প্রাতঃকৃত্যের প্রয়োগ হতে লাগল। এর অনেকদিন পরে সরস্বতী পুজোতে চাঁদা না দেওয়ায় নরেশবাবুর বারান্দাতে চার বদমাশ লাইন দিয়ে বসে প্রাতঃকৃত্য সারে। এছাড়া শোনা যেত যে চোরেরা বাড়িতে জিনিস না পেলে এই কাজ করে যেত। এসবই ভোরবেলার অপকর্ম।

ভোরবেলায় মাঝেমাঝেই দেখা যেত রাতভোর জলসার শেষে ঘরমুখো লোকজনকে। যারা এদেরকে দেখেছে তারা জানে যে শয়ে শয়ে মানুষের এই সংঘবদ্ধ মিছিল এক অসাধারণ দৃশ্য। প্রায় সকলেই অপরের সাথে কথা বলে চলেছে, কেউ চাপা গলায় গতরাতের গান ধরেছে, কোথাও হাসি-মস্করা হচ্ছে, কোথাও চলেছে ঘোর তর্ক - হেমন্ত বনাম শিবাজী, রফির সাথে পি রাজের তুলনা। সারি সারি মানুষ হেঁটে চলেছে কোনও নেতা ছাড়াই, এপাড়া - ওপাড়া করে এগিয়ে চলেছে বিশাল হিউম্যান ট্রেন, যার যেখানে দরকার নেমে পড়ছে। এসব ভেবে মনে হয়, আজ যারা কথায় কথায় আমাদের জাতকে অসভ্য, বিশৃঙ্খল বলে গালি পাড়ে তারা হয়তো আমাদের অনেককিছুই জানেনা।

ভোরবেলায় অফিসের বাবুদের দেখা মিলত না। মাঝেরহাট বা কল্যাণীপাড়ার কারখানার চাকুরে অথবা কাগজওয়ালা, হকার এদেরই দেখা মিলত। আর দেখতাম মাছের লরি, ভোররাতের ফ্লাইট ধরতে যাওয়া ট্যাক্সি, দুরদূরান্ত থেকে ঠিকে কাজ করতে আসা, দিনমজুরের কাজ করতে আসা মানুষের ঢল। গোটা কলকাতা শহর ঘুম থেকে ওঠার আগেই আরেকটা অদৃশ্য শহর তার চারপাশের শহরতলিকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ত। ভোরবেলার সেই আলোকে যেন এক অদ্ভুত জগতের সাথে পরিচয় হতো, যার সাথে দশটা-পাঁচটার জগতের কোনও মিল ছিলনা, ছিলনা কোনও আত্মীয়তা। আজ মনে হয় যে আমার দেখা সেই ভোরবেলার তুলনায় আজকের শৈশব হল যেন দশটা-পাঁচটার জগৎ। ফুটা এখন বিশ্রামের, চটজলদি খাবারের। নতুন যুগের সাথে খাপ খাইয়ে আজকের বাবা-মায়েরা তাই বানিয়ে নিয়েছেন ম্যাকশৈশব। যে অলস ভোরবেলা আমি ছোটবেলাতে দেখেছি, তা এখন উবে গিয়েছে।

পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সমাজ আর প্রকৃতির সাথে অন্তরঙ্গ আলাপের যে অবসর আমরা পেয়েছি, তা এখন হয়তো বিলাসিতা বলেই গণ্য হবে। ভোরবেলার প্রসঙ্গের অবতারণা করতে গিয়ে এই কথাটাই বারবার ঘুরেফিরে মনে আসছে। আজকে যে শৈশব চোখের সামনে দেখছি আমার নয় বছরের সন্তানের জীবনে, মনে হয় তা অনেক বেশি একমুখী এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্মে ভরা। এর পরের অংশে আলোচনা করব এই নতুন শৈশবের অর্থাৎ শৈশব "কী ছিল আর কী হইয়াছে"। এই আলোচনার মধ্যে আমেরিকাতে বেড়ে ওঠা দ্বিতীয় প্রজন্মের কথাই বেশি থাকবে। কেননা আমাদের এখন স্বদেশ বলতে ভারত, আর এদেশ বলতে আমেরিকা।

ম্যাকশৈশবের প্রসঙ্গ

বেঞ্জামিন বার্বার তাঁর "জিহাদ ভার্সাস ম্যাকওয়ার্ল্ড" বইয়ে আধুনিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দুনিয়ার এক মূল দ্বন্দ্বের আলোচনা করেছেন ঃ "The first scenario rooted in race holds out the green prospect of a retribalization of large swaths of human kind by war and bloodshed, a thretened balkanization of nation - states in which culture is pitted againt culture, people against people, tribe against tribe, a Jihad in the name of hundred narrowly conceived faiths against every kind of interdependence, every kind of artificial social cooperation and mutality : against technology, against pop culture and against integrated markets; against modernity itself as well as the future in which modernity issues. The second paints the future in shimmering pastels, a busy potrait of ... forces that demand integration and uniformity and that mesmerizes people everywhere with fast music, fast computers, and fast food - MTV, Macintosh and McDonald's - pressing nations into one homogeneous global theme park, one McWorld tied together ..." আজকের শৈশব হল এই ম্যাকবিশ্বের বাসিন্দা, যেখানে সারা পৃথিবীর কৈশোর যুগপৎ উপভোগ করে পোকেমন, ব্রিটনি স্পিয়ারস, এম টিভি আর কোক। শহরতলির জীবনে দেখা সেই খাপছাড়া বেমক্কা আনন্দ আপাতত শিকেয় তোলা। ম্যাকশৈশবের বাঁশিওয়ালার পিছনে ছুটছে সারা দুনিয়ার ছেলেমেয়েরা। মিঃ বারেসের উদ্ধৃতিতে দেখতে পাই এই অদ্ভুত শৈশবকে।

ভারতে যখন ছিলাম তখন যা দেখেছি, তার থেকে আমেরিকায় বড় হওয়া দ্বিতীয় অভিবাসী প্রজন্মের জীবনে পার্থক্য খুবই কম আছে। সামান্য যেসব তফাত, তার উৎস শুধুমাত্র ভিনদেশের জাতিগত ভিন্নতা। আমার অভিজ্ঞতা সীমিত, মূলত নানারকম আলোচনা আর চোখের সামনে দেখা দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের দেখে যে ধারণা তৈরী হয়েছে তার ভিত্তিতেই লিখছি। একটা কথা এই যে এইসব অভিজ্ঞতা খুবই স্থাননির্ভর। কোনও প্রদেশে প্রচুর ভারতীয় এবং মেলামেশার সুযোগ, আবার কোথাও একাকী জীবন। তবে কয়েকটা মোদ্দা ব্যাপার সবক্ষেত্রেই এক। আজকের শৈশবে কোনও ফুরসৎ নেই ছেলেমেয়েদের। দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় প্রথম প্রজন্মের আরোপিত ইচ্ছার ফলো-আপ। এটা বিশ্বজনীন ট্রেন্ড নিঃসন্দেহে, ম্যাকশৈশবের প্রথম পদ। তবে যেটা লক্ষণীয় সেটা হল যে আমেরিকার খোলামেলা আবহাওয়ার মধ্যেও ভারতীয় বাবা-মা তার সন্তানকে সমাজের থেকে আলাদাভাবে মানুষ করার স্বপ্ন দেখে। শুধু ভারতীয় নয়, এটা মোটামুটি এশিয়ান ট্রেন্ড। জন্ম হয়েছে আরেকটা আমেরিকান স্টিরিও টাইপের। এশিয়ান কিশোর কিশোরী মানেই কেরিয়ার-সর্বস্ব, আনন্দবিমুখ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু জীবন। খেলা, রাজনীতি বা আমেরিকান গানবাজনার জগতে এদের উপস্থিতি নগণ্য।

সমস্যাটা এখানেই শেষ নয়। খোলামেলা মার্কিনি সমাজের মধ্যে গড়ে ওঠার ফলে আমাদের সন্তানদের মধ্যেও চলে এসেছে নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রতিষ্ঠার মানসিক জোর। ফলে একই সিচুয়েশনে যেখানে দেশের বাচ্চাকাচ্চারা মাথা নিচু করে বাবা-মার স্বপ্নপূরণ করার লড়াই চালিয়ে যায়, এদেশে সেখানে অনেকেই বাঁকা হয়ে বসে। যে বয়সে আমরা পেয়েছি কেয়ারফ্রি জীবন, এখন সেখানে ঢুকে পড়েছে বয়স্ক দ্বন্দ্ব। কেরিয়ার-কেন্দ্রিক অণুসমাজ, এবং চোখ না ফুটতেই ভবিষ্যৎ গড়ার তাগিদ - এই দুয়ে মিলে আজকের দ্বিতীয় প্রজন্মের জীবন থেকে ছোটবেলা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

এখানকার ছোটদের জীবনে একটা প্রচ্ছন্ন সমস্যা হল ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝখানে বেড়ে ওঠা। হাঁটি হাঁটি পা পা করার সময় পেরিয়ে যখন থেকে এরা কিন্ডারগার্টেনে ঢুকছে, তখন থেকেই দেখা হয়ে যাচ্ছে নানারকম সমস্যা এবং মানসিকতায় বেড়ে ওঠা শিশুদের সাথে। একটু পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে টিন এজ মা, একাকী বাবা, ডিভোর্স, বয়ফ্রেন্ড ইত্যাদির সাথে পরিচয়। প্রাক্তন বাবা, ভবিষ্যৎ মায়ের দুনিয়া ছাড়াও রয়েছে নানারকম নেশার হাতছানি। এছাড়া ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে চলতে থাকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালোলাগা খারাপলাগার পালা। আর হাইস্কুল মানে রীতিমতো কলেজি মাত্রার যৌনতার ছড়াছড়ি। চারপাশে অনেকেই বাবা-মা হয়ে যাচ্ছে হাইস্কুলে পড়তে পড়তেই। এই পরিবেশে বড় হতে গিয়ে ছোটবেলা থেকে ইনোসেন্স পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে। নাবালকেরা কী জানবে আর কী জানবেনা - এই বিতর্ক এখন মূল্যহীন। রক্ষণশীল ভারতীয় মূল্যবোধ, বাবা-মার প্রতিনিয়ত অনুশাসন আর দৈনিক সমাজের আদিম নাচ, এইসবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় প্রজন্মের ছোটবেলা আজ বড়ো ক্লান্ত, বিভ্রান্ত। এর সাথে যোগ হয়েছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। মোটের উপরে এদেশের সমাজ আমাদের কাছে অপরিচিত। ছোটদের জীবনেও তাই চলে নিরন্তর খাপ খাইয়ে নেওয়ার সংগ্রাম। যেখানে ভারতীয় সমাজ সংখ্যায় বড়, সেখানে কিছুটা নিজেদের মতো আর দশজনের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ থাকে। অনেক শহরে গড়ে উঠেছে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে কিছুটা মনের রাশ আলগা করে মেলামেশা করার সুযোগ মেলে। এ সত্ত্বেও দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে ভারতীয় পরিবেশ পাওয়াটা প্রায় সপ্তাহান্তের ভ্রমণের মতোই, শুরু না হতেই অবসর হয়ে যায় শেষ। আমাদের ছোটবেলাতে যে গন্ডা গন্ডা নানারকম ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেড়ে উঠতে উঠতে হাজাররকম মজা পেতাম এখানে সেই সহজ সরল আবহাওয়ার কোনও অবকাশ নেই।

আমাদের ছোটবেলায় পড়াশুনোর বাইরের সময়টা ছিল আমাদের একান্ত যা ইচ্ছে খেলো বা করো - তাতে বড়দের খুব একটা খবরদারি ছিলনা। বলা যায় যে বড়দের সমাজের মাঝখানেই ছোটদের একটা স্বশাসিত মুক্ত এলাকা আমরা উপভোগ করতাম। আজকে চারদিকে তাকালে সেই মুক্তাঞ্চল আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তা সে স্বদেশের সমাজই হোক বা এদেশের। আজকের বাচ্চারা তাদের ফ্রি টাইমে কী পড়বে তা প্রায় পুরোটাই নির্ভর করছে বাবা মায়েরা কী চাইছেন তার উপরে। কোথাও বাবা মা নেমে পড়েছেন ছেলেকে শচীন বা লিয়েন্ডার বানানোর যজ্ঞে, আর কোথাও তাঁরা বানিয়ে দিচ্ছেন অবসর সময় প্রয়োগ করার বিধান। স্বদেশে যেটা নিছক মধ্যবিত্ত ওয়ান আপম্যানশিপ, এদেশে সেটা আসছে কলেজে স্কলারশিপ পাওয়ার ইঁদুর দৌড়ের চাপে। এদেশে ভালো কলেজে পড়ানোর খরচা প্রচুর। কলেজে জলপানির ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তা নির্ভর করে পড়াশুনা ছাড়াও তুমি কী করেছ তার উপর। অর্থাৎ তোমার কোনও সমাজসেবা আছে কিনা, তুমি দু একটি খেলাতে বিশেষ পটু কিনা, তুমি পত্র-পত্রিকাতে লিখে থাকো কিনা, তুমি কী কী ধরনের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি। আমাদের ভারতীয়দের কাছে গোটা জিনিসটা হয়ে দাঁড়ায় পড়াশুনার বাইরে পড়াশুনা। স্কুলের বাইরে সবুজ মাঠ কোনও মুক্তি নিয়ে আসেনা, সেখানে যেন দাঁড়িয়ে আছে আরেকদল মাস্টারমশাই, আর ঘাড়ের উপর পড়ছে বাবা-মায়ের নিশ্বাস। এর বাইরেও বহু ফ্যামিলি আছেন, এদেশে এবং স্বদেশে, তবে তাঁরা সংখ্যায়

কম। তবে একটা কথা এখানে বলে নেওয়া দরকারি, শৈশব যদি কোথাও বেঁচে থাকে তবে তা আছে এদেশের প্রাথমিক স্কুলে। যেটুকু যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে যে শিশু কিশোর মনের অবারিত বিকাশ এবং নানারকম চাপ ছাড়াই বিষয়বস্তু শেখানোর পদ্ধতি অতুলনীয়। প্রাইমারি স্কুলের চার দেওয়ালের মাঝেই রয়েছে ছোটবেলার অফুরন্ত উপকরণ। শৈশব যদি কোথাও বেঁচে থাকে তবে তা আছে এখানেই।

হারানো এবং না পাওয়া শৈশব

আজকের শহরতলিতে ভোরবেলা ঠিকই আছে, শুধু নেই আমাদের সন্তানদের অপ্রয়োজনীয় উপস্থিতি। তারা এখন ব্যস্ত ম্যাকশৈশবের তাড়নায়। এরপর কী? তার বিচার করবেন সমাজবিজ্ঞানীরা। উন্নয়ন কী, প্রয়োজন কতটা, সাফল্য বলতে কী বোঝায় - এ সবই নতুন করে খতিয়ে দেখা দরকার। তবে আমরা দেখছি যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যেমন আমাদের জীবন থেকে অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার খুলে নিয়েছি, তেমনই আমাদের পরের প্রজন্মের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি শৈশব। এভাবেই আমাদের দেখা শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এই হারানো শৈশবের জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে বাবা মায়েরা নিছক উপলক্ষ। বিশ্বযুদ্ধের সময়ের উন্নত দুনিয়ার মেয়েদের কর্মীদলে নাম লেখাতে হয়েছিল, কেননা ছেলেরা গিয়েছিল যুদ্ধ করতে। এর থেকে সৃষ্টি হয়েছিল হাজারো সামাজিক আন্দোলন আর পরিবর্তন। আজকের হারানো শৈশবও এরকম অনেক বড়ো বড়ো কারণের ফলে জন্ম নিয়েছে। আমরা নিছক ক্রীড়নক মাত্র। এসব লিখতে গিয়ে মনে পড়ে তাদের কথাও, যাদের জীবনে শৈশব কখনও দেখা দেয়নি। সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি শিশু কিশোর তাদের শৈশব কাটাচ্ছে একটা ভিন্ন জগতে, যে জগতের সাথে আমাদের পরিচয় শুধু সিনেমার পর্দায়, অথবা বইয়ের পাতায়। এদের কাছে শৈশব হারানো নয়, অদেখা। হারানো শৈশবের কথা শেষ করার সময় মনে হয় যে এদের কথাও থাকা দরকার। লেখা তাই শেষ করছি একটি ছোট্ট মেয়ের অসাধারণ কবিতা দিয়ে।

শৈশব কী?

কেউ আমায় বলতে পারো, শৈশব কী?
আমি তা কখনও দেখিনি।
আমার ছোট্ট হাতদুটো ব্যথায় ভরা।
ভোর থেকে রাত চায়ের দোকানে খাটছে।
শহরের কত বাড়ির ইঁট আমি টেনেছি,
ইঁটে গড়া একটা থাকার জায়গা নেই আমার।
আমি চাই একটা খেলা করার পুতুল
আর মায়ের নরম কোল।
ভোর থেকে রাত হাতদুটো আমার খাটছে,
কেউ আমায় বলতে পারো শৈশব কী?

("The Hindu", গার্গী চৌহান, সপ্তম শ্রেণী, ময়ূর পাবলিক স্কুল, নিউ দিল্লি।)

স্বপ্নের আমি, আমার স্বপ্ন

ইন্দ্রজিৎ রায়

আমার ছোটবেলায় নিজের চোখে আমি নিজেই ছিলাম পৃথিবীর সবথেকে ভাল মানুষটি। বাকি সবাইকে দেখতাম নিজের মাপকাঠিতে। এবং স্বভাবতই সেই মাপকাঠিতে আমাকে ছোঁয়ার সাধ্য ছিল না কারওর। আসলে ছোটবেলায় মনে একটা স্বচ্ছতা থাকে, সবকিছুকে সাদা বা কালো বলে চিহ্নিত করার একটা সহজাত ক্ষমতা থাকে আমাদের, যদিও জীবনটা হয় বর্ণময়। লাল-নীল-সবুজের মেলার ভিড়ে হারিয়ে যেতে চায় অবুঝ মন। কল্পনার ডানায় ভর করে পাড়ি দেওয়া যায় দূর থেকে দূরে। সেই রূপকথার রাজ্যের রাজা হয়ে উঠি আমরা নিজেরাই, পারিপার্শ্বিকের প্রেক্ষাপটে আলাদা করে চিনতে শিখি নিজেদের। চারপাশটাকে দেখে মনে মনে বাকি সবার থেকে নিজেকে একটা আলাদা স্তরে (layer) চিহ্নিত করা যায় সবার থেকে আলাদা ভাবে।

আজ কিন্তু পরিস্থিতিটা বদলেছে অনেকেই। নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে ভাবার সাহস আর নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ কেন, নিজেকে ঠিক ভাবে চিনতেই অসুবিধে হয়। সাদা আর কালোর সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সব পরিচয়, সব উপসর্গই ঝাপসা লাগে। একেই বোধহয় আইডেনটিটি ক্রাইসিস বলে। কিন্তু এটা কারওর ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, সমস্যাটা আজকের সময়ের, আজকের প্রজন্মের। এই মুহূর্তে ভারতের লক্ষ কোটি মানুষ তাই সমস্যায় ভুগছেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার যদি তাঁরা নিজেদের প্রশ্ন করেন, 'আমি কে? আমি কেন?' তবে দৈনন্দিন জীবনের অনেক অঙ্কের হিসেবই বদলে যাবে, পাল্টে যাবে অনেক সমীকরণ। আর সময়ের আয়নায় দেখতে গেলে খুঁজেই পাওয়া যাবেনা নিজেদের।

প্রশ্ন হল এমনটা কেন? এই আইডেনটিটি ক্রাইসিসের জন্য দায়ী কে? ব্যক্তি? পরিবার? সমাজ? রাষ্ট্র? উত্তরের খোঁজে আমাদের একটু পিছন ফিরে তাকাতে হবে। আত্মস্থ করতে হবে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে। নজর রাখতে হবে সময়ের গতিপ্রবাহের দিকে।

১৯৪৭ কে আমরা মনে রেখেছি দেশ স্বাধীন হবার জন্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে কজন ঐ সালটাকে দেশভাগের বছর বলে চিহ্নিত করব? সমস্যার শুরুটা সেখান থেকেই। তার আগে অবধি আমরা জানতাম, 'আমরা স্বাধীনতা চাই'। এর আগে, পরে বা মাঝে অন্য কোনও শব্দ ছিলনা। ১৯৪৭-এ আমরা জানলাম, 'আমরা (দেশভাগের মূল্যে) স্বাধীনতা চাই'। প্রথমবার বুঝতে শিখলাম থার্ড চয়েস বলে একটা তুলনামূলক সহজলভ্য পণ্য আছে।স্বাধীনতা পাওয়া আর না পাওয়ার মাঝের এই পণ্যটাই আমাদের দর্শনকে বদলে দিল। সাদা আর কালোর মধ্যেকার এই অজানা রঙটাই আমাদের চিন্তাধারাকে মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিল। তখন থেকেই আপসের ইতিহাসের সূচনা। তার আগেও এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত যা আছে সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ অন্যত্র পাওয়া যাবে। দেশভাগের পরের ইতিহাসটুকু আরও করুণ। ছোটবেলা থেকে খিটখিটে সৎমায়ের হাতে মানুষ হওয়া শিশু পুনর্বার মাতৃহারা হলে তার যে অবস্থা হয়, ইংরেজ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমাদেরও হল সেই একই দশা। ইংরেজ দেশ ছাড়ার পর অনতিবিলম্বেই আমরা উপলব্ধি করলাম যে দেশটা একটা ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছে। একটা নেই-রাজ্যের, নৈরাজ্যের বাসিন্দা আমরা। দেশের জনসংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তার জন্য সংস্থান নেই অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের। একটা জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো মূল্যবোধ বা আত্মবিশ্বাস

- কোনওটাই নেই আমাদের। তারই মাঝে আবিষ্কার করলাম - স্বাধীনতার আগে যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ পণ করে লড়েছেন, দিনের পর দিন কাটিয়েছেন জেলের অন্ধকারে, স্বাধীনতার পরে তাঁদের অনেকেই বেছে নিয়েছেন বিলাসবহুল জীবনযাত্রা। বোঝা গেল, এ স্বাধীনতার জন্য তৈরি ছিলাম না আমরা।

এভাবে চলতে চলতে সময় যখন প্রায় থমকে গেল, তখন নতুন সময়ের, নতুন বার্তা নিয়ে আমাদের সামনে এল একদল তরতাজা ছেলেমেয়ে। নতুনভাবে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করল আমাদের। সগর্বে ঘোষণা করল - সত্তরের দশক, মুক্তির দশক। কিন্তু হায় রে গণতন্ত্র! তাদের সেই উপলব্ধিকে অচিরেই টুঁটি টিপে হত্যা করা হল। সেদিনের ঘটনার যথার্থতা বিচারের জন্য চুলচেরা বিশ্লেষণ পন্ডিতেরা করেছেন, করবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যা বুঝেছিল তার মোদ্দা কথাটা হল - বেঁচে থাকার সবথেকে নিরাপদ রাস্তাটা হল 'সাধারণ' হয়ে থাকা। সবাই যা বলছে তাই বলো, সবাই যা করছে তাই করো, সবাই যা মানছে তাই মানো। সবাই যদি স্বপ্ন দেখে তুমিও দেখো। প্রয়োজনে তার জন্য মোটা ফ্রেমের চশমা পরো।

সত্তরের পর থেকে রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা কমেছে অনেকটাই। সাথে সাথে ভীষণভাবে বদলেছে সামাজিক জীবন। বিশেষত অর্থনৈতিক উদারীকরণের সাথে সাথে আমরা যেন অনেকটাই 'আধুনিক' হয়ে উঠেছি। বেড়েছে প্রতিযোগিতা। পশ্চিমের দুনিয়াকে যতো বেশি বেশি জেনেছি উন্নততর পরিষেবার মাধ্যমে, ততই যেন তাকে 'মডেল' হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু এখানেও সেই চিরাচরিত ভুল - ওদের জীবনের গোড়ার কথাগুলো আত্মস্থ করার বদলে কেবল চটকদার বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেগুলির অন্ধ অনুকরণেই ব্যস্ত হয়েছি আমরা। বড়ো পরিবার ভেঙে ছোট হয়েছে। শুরু হয়েছে ইঁদুর দৌড়। ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ও চিরন্তন উপকরণগুলিকে অবজ্ঞাভরে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সস্তা ভোগবাদী সংস্কৃতিকে নিয়ে - এটা না বুঝেই যে আমেরিকার আর ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক নয়। এর মধ্যে এসে জুটেছে হাওলা - গাওলা - তেহলকা। আর শুধু নেতারাই বা কেন, দুর্নীতি তো প্রবেশ করেছে সব স্তরেই। সে বাংলাদেশের বর্ডারে সীমান্তরক্ষীদের হাত ধরে হোক বা ট্রেনের চেকারের কালো কোটের পকেট থেকে। কোটি কোটি গরিবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেশের নামিদামি সরকারি কলেজগুলিতে যাদের পড়ানো হয় তাদের কজন সেই বিশাল অর্থব্যয়কে যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে? আর ছোট-বড়ো অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস রচিত হচ্ছে প্রতিদিন, তার মাঝে দিশেহারা আমরা। বাজার অর্থনীতির জন্য যে পণ্যবাদ এসে ঢুকেছে, তা আমাদের চাহিদাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছে। একেবারে ছোটবেলা থেকেই আমাদের দেখানো হচ্ছে অনেক - অনেক 'বড়ো' হওয়ার স্বপ্ন।

ধরে নেওয়া যাক 'আপনি' এমন একটি চরিত্র যাঁর জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু - সবই এই ২০০৩ সালে। আরও ধরে নিলাম আপনি কলকাতা বইমেলা ২০০৩-এ এসেছেন বই কিনতে, সময় কাটাতে ও চিকেন রোল খেতে। সেক্ষেত্রে এটুকু হলফ করে বলে দেওয়া যায় যে আপনার জন্মের পরে-পরেই আপনার বাবা-মা আপনার মুখের সামনে ধরেছিলেন সেরেল্যাক ভর্তি চামচ, আপনি চারবছর বয়েসে শিখেছেন "E for elephant" এবং ক্রিকেট ছাড়া আর যে খেলাটা আপনি জানেন সেটা হল ভিডিওগেম। প্রাইমারি, হাই,

সিনিয়র হাই - সব স্কুলেই আপনাকে শেখানো হচ্ছে ইতিহাস - ভূগোল - ইংরেজি - গণিত - ভৌতবিজ্ঞান - ফলিত অর্থনীতি। ইঁদুর দৌড়ে আপনি পিছিয়ে থাকুন বা এগিয়ে, ছড়া-পড়া-নামতার নিত্যনৈমিত্তিকতার পুনরাবৃত্তি আপনার খারাপ লাগতে বাধ্য। কিন্তু হলে কী হবে, আপনার চারিদিকে রয়েছে আধুনিক সভ্যতার হাতছানি। এই সভ্যতা আপনাকে বলে সিঁড়িতে পা রেখে আস্তে আস্তে উপরে উঠে যেতে। একটু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, একটু খ্যাতি, যশ - এসবের লোভ সংবরণ করা হয়ে ওঠে কষ্টসাধ্য কাজ। বাহুল্য না হয় বর্জিতই থাকল, কিন্তু অন্তত পেট চালানোর তাগিদে তো কিছু করা দরকার। চাকরির বাজারের মন্দার মধ্যে কাজ যদিবা পাওয়া যায়, job satisfaction তো আর ইন্টারভিউ দিয়ে পাওয়া যায়না। সরকারি চাকরিতে ভালো কাজ করতে গেলে হয়তো আপনার জামার কলার আটকে যাবে সহকর্মীর ছাতার অগ্রভাগে। আর বেসরকারি চাকরিতে খাটতে হবে ধোপার গাধার মতো, করতে হতে পারে অনেক অপ্রিয় ও অনৈতিক কাজ। নিজেকে নিজের মতো করে আবিষ্কারের সুযোগ যাবে হারিয়ে। আর এসবের বদলে যদি ব্যবসা করার ফন্দি এঁটে বসে থাকেন তবে তো আর কথাই নেই। পাড়ার 'দাদা', পার্টির 'দাদা', দালাল 'দাদা', ইউনিফর্ম পরিহিত 'দাদা' - এদের দাদাগিরি সামলাতে সামলাতেই পিঠ যাবে ঝুঁকে, মাথা হবে হেঁট। জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা হোক বা না হোক, এতদিনে আপনার বিয়ের বয়েস হয়েছে। এমতাবস্থায় দুটো সম্ভাবনা থাকে। এক, আপনি বিয়ে করবেন। দুই, আপনার বিয়ে হবে। (প্রথমটি হলে আপনি আমার দাদা, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বৌদি।) অতঃপর আপনি দেশের জনসংখ্যা বাড়াবেন - তবে বেশিমাত্রায় নয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সহজপাঠ আপনি স্কুল-কলেজে শিখেছেন। তারপর ছেলেমেয়েরা যতো বড়ো হয়ে উঠবে ততই বেশি বেশি করে আপনি উপলব্ধি করবেন যে তারা ঠিক আপনার মত করে বেড়ে উঠছেনা। ওদের চলন, বলন, দর্শন, মনন - সবকিছুই আপনার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। এই জেনারেশন গ্যাপটুকু যদি মেনে নিতে পারেন তবে আপনার ভালো। না পারলে ওদের খারাপ। আর এইভাবে চলতে চলতে যখন ওদের সময় হবে নিজেদের ক্ষুণ্নিবৃত্তির ব্যবস্থা নিজেরাই করার - ততদিনে আপনি অবসরের মুখে। আর একবার অবসর হয়ে গেলে তো আরও অসুস্থ একটা জীবনযাপনরীতি। আপনার ছেলেমেয়ে আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবেনা এই সান্ত্বনাটুকু দিয়ে বলতে পারি আপনার নিজের বাড়িতেই আপনি হয়ে উঠবেন ভীষণ একা। কারণ আপনার ছেলে চাকুরিজীবী, ছেলের বৌ নিজের বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই বাচ্চাটি রূপকথা ভালোবাসেনা এবং কয়েক যুগ আগে যাঁর সাথে আপনি ছাঁদনাতলায় গেছিলেন তিনি (যদি তখনও জীবিত থেকে থাকেন) সকাল-বিকেল দুবেলা আপনাকে সান্ত্বনাবাক্য শোনান, "বুড়ো বয়সে ওটুকু সহ্য করতেই হয়"। রোজ রাতে শুতে যাওয়ার আগে আপনি একবার করে মনের সেই অদৃশ্য স্কোরবোর্ডে একটা করে রান যোগ করে নিতে থাকবেন। বড় স্কোরের আকাঙ্ক্ষাটুকু ততদিনে হয়ত অনেকটাই মিইয়ে গেছে। আর তারপর একদিন আপনাকে সেটুকুও করতে হবেনা। কারণ সেদিন রাতে আপনি আর নতুন করে শুতে যাবেন না।

এইভাবে চলতে চলতে আমাদের সবথেকে বড়ো ক্ষতি যেটা হয় তা হল আত্মমূল্যায়নের সময়, সুযোগ, প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা ক্রমশ কমে আসে। দৈনন্দিন ব্যস্ততা, পারিপার্শ্বিক চাপ, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, সহযোদ্ধাদের গতে বাঁধা জীবন - এসব নিয়েই এখন আমাদের 'মগজে কারফিউ'। আর আত্মমূল্যায়নটুকু করে উঠতে পারলেই অনেকসময়ই স্বাধীনভাবে নিজেকে শুধরে নেওয়ার মত পরিস্থিতি থাকেনা, আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও। একদিকে সহজ-সরল

প্রাণবন্ত জীবনের স্বপ্ন আর অন্যদিকে কঠিন বাস্তবের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক জীবনের জটিল সব সমীকরণের মাঝে নিরাপত্তার আশ্বাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি - এ দুইয়ের মাঝে স্যান্ডউইচ হয়ে বেঁচে আছি আমরা। আমাদের মধ্যেই জন্ম নেয় এক নতুন 'আমি'। এক 'আমি' ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ - সবকিছু নিয়ে রোজ বেঁচে থাকে। আরেক 'আমি' সুযোগমত অসচেতন মুহূর্তে আমাদের বিবেককে, মূল্যবোধকে, আমাদের সত্তাকে আঘাত করে। আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সব কালো আর সব সাদাকে আলাদা আলাদা দুটো ভাগে ভাগ করে দেখিয়ে দেয়। পদে পদে আমাদের বাধ্য করে খারাপ থাকতে। সেই খারাপ থাকার কারণটা আমরা খুঁজে উঠতে পারিনা। তখনই বোধহয় বলে উঠি, "মন ভালো নেই, মন ভালো নেই, মন ভালো নেই"। ছোট্ট বয়সে হয়তো বা এই খারাপ লাগাটা আমাদের অনেককে ছুঁতে পারেনা। কিন্তু যতোই বড়ো হয়ে উঠতে থাকি, ততই এই খারাপ লাগার প্রবণতা আর গভীরতা দুটোই বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে এই ব্যক্তিগত অনুভূতিটা সঞ্চারিত হয় এক থেকে বহুতে। ক্রমে ক্রমে সেটাই ক্যান্সারের মতো গ্রাস করে সকলকে। সব পাওয়া, সব সাফল্য, সব বিজয়গর্ব কাহিনির মাঝে কী একটা স্বপ্ন যেন অধরা থেকে যায়। কানের কাছে কে যেন বারবার এসে বলে যায়, "তোমার কিন্তু কিছু করার কথা ছিল"। ফিসফিস করে।

যা হারায় না

প্রদোষ সোমরায়

যুগ বদলেছে, সময় বদলেছে এবং বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সমাজও বদলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। স্বাভাবিকভাবেই বদলেছে শৈশবের চরিত্র। শৈশব হারিয়েছে কি না সে প্রশ্ন অবান্তর, শৈশব হারায়নি, শুধু চরিত্রগত পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে।

আসলে শৈশব প্রতিটি মানুষের কাছে বড়ো সুখের সময়। সদ্য ফোটা চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখে সবাই। সবই যেন নতুন, সবই অবাক করা, আশ্চর্যের। তাই শৈশবের সময়টা সহজে দাগ কেটে যায়। আর সেজন্যই বড় হয়ে, বুড়ো হয়ে লোকে বারবার ফিরে তাকাতে চায় শৈশবে। পরিণত জীবনের গুরুদায়িত্বের বোঝা কাঁধ থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সরিয়ে ফিরে যেতে চায় দায়িত্বহীন শৈশবে। হ্যাঁ, শৈশবে যে থাকেনা ঘাড়ের উপর দায়িত্বের বোঝা, যা জীবন চাপিয়ে দেয় বড়ো হবার সাথে সাথে।

আর শৈশব প্রিয় বলেই প্রতিটি ব্যক্তি তার পরবর্তী প্রজন্মের শৈশবের তুলনা করতে চায় নিজের শৈশবের সাথে, এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সে তুলনা হয় পক্ষপাতপূর্ণ। একজন বাইরের লোকের চোখ দিয়ে সে বিচার করে পরবর্তী প্রজন্মের শৈশবকে এবং তার সাথে তুলনা করে নিজের শৈশবের, যা তার একান্ত নিজস্ব অনুভূতি। ফলে সে সাধারণত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা হল, আমাদের সময়ে শৈশব আরও ভাল ছিল, আরও মজাদার ছিল; এখনকার শৈশবে যেন সেই মজা নেই, বড়ো যান্ত্রিক। সুতরাং শৈশব হারিয়ে গেছে। আসলে তার নিজের জীবনযাত্রা, শৈশবোত্তর যান্ত্রিকতা তার দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই সে বর্তমান শৈশবের মজা, ভালোলাগাগুলো খুঁজে পায়না। মনে হয় যান্ত্রিক। কিন্তু শৈশব কখনই তা নয়। শৈশব সবসময় ফাঁকফোকর খুঁজে নেয়, মজা তৈরি করে নেয়, ছোটখাটো ভালোলাগা সবসময়ই শৈশবে আছে। এটাই শৈশবের ধর্ম। শৈশব পেরিয়ে যাওয়া একজন সাধারণ মানুষ তা খুঁজে পাননা, কারণ তাঁর সেই শৈশবের সরল অজ্ঞানতাময় দৃষ্টি নেই।

তবে হ্যাঁ, এটাও ঠিক যে শৈশবের চরিত্রগত পরিবর্তনটা ঘটেছে একটু দ্রুতই। আটের দশকের শেষদিক থেকেই এর সূত্রপাত। একদিন সকালে উঠে হঠাৎ সকলে খেয়াল করল বাচ্চাগুলো হঠাৎ করে বড়দের মতো আচরণ করছে। এবং নয়ের দশকের প্রায় গোড়া থেকেই ধুয়ো উঠেছে শৈশব বিপন্ন। শৈশবের সময়সীমাও কমে গেছে। কারণগুলো বহুচর্চিত। যেমন - যৌথ পরিবার ভেঙে নিউক্লীয় পরিবার তৈরি হওয়া, টিভির আগ্রাসন, তীব্র প্রতিযোগিতা, সার্বিক অবক্ষয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি শিশু সবসময় তার নিজস্ব, একান্ত নিজস্ব একটা জগৎ গড়ে নেয়। সেই জগৎটাই তার শৈশবের আধার। সে আদিমকালে ছিল, রবীন্দ্রনাথ - অবনীন্দ্রনাথের কালে ছিল, এখনকার তীব্র প্রতিযোগিতার কালেও আছে। শিশু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ভৃত্য যেমন গন্ডি টেনে চলে যেত আর তিনি জানলার ধারে বসে বটগাছ দেখতে দেখতে একটা নিজের জগৎ তৈরি করে নিতেন, তেমনই আজকের শিশুরাও নার্সারি স্কুলের অফ ক্লাসে, টিভিতে কার্টুন দেখতে দেখতে নিজের জগৎ গড়ে নেয়। তবে সেই জগতের চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের শিশুদের জগতে ভিড় টিনটিন, সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, লারা ক্রফট, শক্তিমান, হৃতিক, করিনাদের। হবে না-ই

বা কেন? টিভিতে সবসময় সিনেমা, কার্টুন ইত্যাদি।

একটা রম্যরচনা পড়েছিলাম, সন্ধ্যেবেলার অন্ধকারে এক মহিলা নর্দমায় পড়ে গেছেন। একটু পরে এক ভদ্রলোক এলেন ছেলেকে নিয়ে, ভদ্রমহিলা উদ্ধারের আশায় হাত তুললেন। সেদিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক ছেলেকে বললেন, "দেখেছো বাবাই, বলেছি না, অন্ধকারে বেরিয়ো না। অন্ধকারে বেরোলে কী অবস্থা হয় দ্যাখো", বলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেটি যেতে যেতে চিউয়িং গাম চিবোতে চিবোতে বলল, "সুপারম্যান এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে"। এদের নিয়েই তো আজকের শৈশব।

আসলে আমাদের সমস্যাটা এখানেই। পূর্ব প্রজন্মের মানুষদের কাছে আজকের শৈশবের এই সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান বা হৃতিক, করিনাদের হিরো হওয়াটা মোটেই পছন্দের নয়। কারণ তাদের শৈশবের হিরো এরকম ছিলনা। তাদের নায়কেরা ছিল অনেক বেশি কল্পনা ও বইয়ের জগতের বাসিন্দা, এই রকম শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যমের (audio-visual medium) নয়। ফলে আজকের বড়োরা, যাদের শৈশবের কল্পনার জগতের অধিবাসী ছিল ঠাকুরমার ঝুলির লালকমল, নীলকমল বা বুড়ো আংলার রিদয় তাদের মনে হয়, ইস্! আজকের শিশুরা জানলই না এদের, কী যে স্পাইডারম্যান-সুপারম্যান করে? শৈশবটাই এদের হারিয়ে গেছে।

বোঝাই যাচ্ছে, টিভি এসে আমাদের শৈশবের চেহারাটায় একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছে। কারণ আজকের শৈশবের চরিত্রগুলো সবাই টিভির পর্দার বাসিন্দা। আর টিভির মতো শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম তো বইয়ের থেকে আকর্ষক হবেই সাধারণ শিশুর কাছে। বিশেষ করে নিউক্লীয় পরিবারে যখন খেলার সঙ্গী সাথির অভাব তখন টিভিতে কার্টুন নেটওয়ার্ক সত্যিই আকর্ষক সাথি বটে। রঙ-বেরঙের পোশাক আশাক পরা ছেলেমেয়েদের নাচ গানও কম আকর্ষক নয়। তাছাড়া এইসব সিনেমা বা কার্টুনের নায়কেরা অন্তত নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে দুর্বলের রক্ষাকারী, অত্যাচারীর যম। সুতরাং এরা খারাপ শিক্ষা দিচ্ছে শিশুদের এমন অভিযোগ করাটাও ঠিক নয়। আমাদের বাবাই জানে কেউ বিপদে পড়লে সুপারম্যান এসে উদ্ধার করে, তাই সে স্বাভাবিক ভাবেই বলেছে যে সুপারম্যান এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

অনেকে বলেন, আজকের এই শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম শিশুদের যৌনতা শেখায়, ভায়োলেন্স শেখায়। সেদিক থেকে বলতে গেলে, রূপকথার গল্পও গল্পের মোড়কে কম যৌনতা বা ভায়োলেন্স শেখায় না। কিন্তু সেটা গল্প, শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যমের অংশ নয়, তাই শিশু শ্রোতা সেখানে নিজের মতো করে কল্পনা করে নেয় প্রেম-যৌনতা ও মারামারির দৃশ্যগুলো; অন্য দিকে শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম সরাসরি শিশুমনে ঢুকিয়ে দেয় ওই প্রেম-যৌনতা, মারামারির দৃশ্যগুলো। ফলে একটা মূলগত পার্থক্য থেকেই যায় গল্প শোনা আর টিভি দেখার মধ্যে। কিন্তু বর্তমান সমাজ ও প্রযুক্তির কথা ভেবে দেখতে গেলে সেই পার্থক্যটুকু আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে; কেননা, টিভি ছাড়া আজকের ফুটা প্রায় অচল। (হ্যাঁ, কেউ যদি তাঁর সন্তানকে মানুষ করতে চান টিভি ইত্যাদির প্রভাবমুক্ত করে, তবে সেই শিশুটি কল্পনা খেলাবার সুযোগ অন্যদের থেকে বেশি পাবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে অন্তত নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে, যেটা তার মনে বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে। আর সত্যি কথা বলতে এরকম বাবা-মা কমই আছেন, এটা খানিকটা দুর্ভাগ্যের!)

আসলে যে জিনিসটা বড়ো চোখে লাগে তা হল প্রতিযোগিতা। সমাজের তীব্র প্রতিযোগিতা ভীষণ প্রভাব ফেলেছে শৈশবে। এবং সেজন্যেই শৈশবের সময়সীমা গেছে কমে। এর পেছনেও সেই একা থাকা, বাবা-মায়ের তাড়না প্রথম হবার এবং যথারীতি শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম।

প্রতিযাগিতা আগেও ছিল, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, প্রাইমারি স্কুলে বিশেষ কারওর পাশে বসার জন্য প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়নি একদিনও? তবে প্রতিযোগিতা স্বাভাবিকভাবেই এখন অনেক তীব্র ও ব্যাপক। আগের শৈশব হয়তো কোনও হারের প্রতিশোধ নিত কল্পনায়, কিন্তু এখনকার শৈশব বাস্তবেও প্রতিশোধ নিতে পিছপা হয়না। সহপাঠীর বসার চেয়ারে তাই ছুঁচালো পেনসিল খাড়া করে রেখে দিতে পারে। আর অমনই রব উঠে যায়, গেল, শৈশব জাহান্নামে গেল। কিন্তু এরকম ঘটনা কি আপনার শৈশবে ঘটেনি? ঘটনাটা খুব একটা বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু, ছোটবেলায় আপনিও বন্ধুর সাথে মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছিলেন। অপরাধের মাত্রা, মোটিভ ও তৎকালীন সমাজ বিচার করে দেখলে এটাকে কি শৈশব 'হারিয়ে যাবার' নিদর্শন বলা যায়? বোধহয় না। তাই বলে আমরা এই ধরনের অপরাধকে প্রশ্রয়ও দেব না।

যুগটা তথ্যপ্রযুক্তির তো, তাই আজকের শিশুরা চটপট বড় বেশি জেনে যায়। আর না জানলেও প্রকাশ্যে অবাক হয়না সহজে। আসলে আজকের শিশুরা বেশি স্মার্ট। তারা জানে, কিছু দেখে অবাক হলে সবাই বুঝে যাবে যে সে কিছু জানেনা, আর সেটা লজ্জার! সুতরাং বাইরে সে চট করে অবাক হয়না। আর বড়ো তাড়াতাড়ি সব জেনে যায় বলেই শৈশব বড়ো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। না জানাই যে শৈশবের ধর্ম, কারণ না জানলেই কল্পনা করা যায় ফলাও করে, স্বপ্ন দেখা যায়।

আজকের শিশুও আগের মতোই স্বপ্ন দেখে। আমার চেনা জানা কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাদের ইচ্ছাপূরণ করার সুযোগ দেওয়া হলে তারা কী চাইবে? যে উত্তরগুলো পেয়েছিলাম তা হল:

> সব স্কুল তুলে দেওয়া / দিদিমণি-মাস্টারমশাইদের সব ভুলিয়ে দেওয়া / ছুটি বাড়ানো, নতুন মডেলের পুতুল / গেমস / ভিডিও গেমস উপহার পাওয়া, সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় এমন টিভি / কম্পিউটার যাতে ইচ্ছে হলেই টিভি দেখতে বা গেম খেলতে পারে, এবং অবশ্যই বাবা-মার শাসন থেকে মুক্তি।

একটু ভেবে দেখুন তো আপনার ছোটবেলাতেও চাহিদাগুলো খানিকটা এরকম ছিল কি না? বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে রূপকথার বইয়ের জায়গা নিয়েছে কম্পিউটার গেমস, এই যা তফাৎ। আসলে শিশুমন আগের মতোই রয়েছে, শুধু পারিপার্শ্বিকের সাথে তার চাহিদা বদলেছে মাত্র।

শৈশব বড় সংবেদনশীল। একটি শিশু যত দ্রুত জেনে নিতে থাকে সমাজকে তত দ্রুত সে পা বাড়ায় শৈশবোত্তর জীবনে এবং সে জীবন বড় কঠিন। শৈশবটাকে আগের প্রজন্ম যতটা সময় ধরে উপভোগ করতে পেরেছে, এই প্রজন্ম পায় তার চেয়ে কম সময়। সেটা অবশ্যই দুর্ভাগ্যের, কারণ এই একটা সময়ের গর্বই মানুষ করতে পারে সবসময়। কিন্তু শৈশব হারিয়ে গেছে এই দাবিটা অবান্তর। শৈশব ঠিক ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে নিজের কল্পরাজ্য তৈরি করে নেয়।

অবশ্য তাই বলে আমরা শৈশবকে নিজেই ফাঁকফোকর খুঁজে নেবার দায়িত্ব দিয়ে সমাজকে আরও প্রতিযোগিতামূলক, আরও নিশ্ছিদ্র করে তোলার সাধনায় মগ্ন হব না। আমাদেরই উচিৎ শৈশবকে সুযোগ করে দেওয়া তার কল্পরাজ্য আরও বিস্তারের।

শৈশব কখনও মরে যায় না, হয়তো সংকুচিত হয় সাময়িকভাবে। শৈশব কখনও হারায় না।

অবনীন্দ্রনাথ 'খাতাঞ্চির খাতা'য় লিখেছেন,

'ছেলে-মেয়েরা যদি জেগে থাকতে পারত তবে তারা দেখতে পেত, সব কচি ছেলেকে

তাদের মা চাপড়ে-চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে আস্তে-আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে সবার মনের মধ্যেকার ছোট্টোখাট্টো সিন্দুকগুলি খুলে তার পরদিনের জন্যে বেশ করে গুছিয়ে রাখছেন। ... সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকোনো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেললে মুশকিল হবে, তাই এই দেরাজে চাবি নেই, একটা করে কীল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি! সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায়, এমন কি রাতের স্বপ্নের ছবিও, এই ছোট্টো খাতায় রোজ-রোজ নতুন-নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে। এ খাতা এমনি চমৎকার এমনি চকচকে যে ছেলেরা হাতে পেলে তার মলাট চিবিয়ে সন্দেশ বলে সেটাকে খেয়েই ফেলত। তাই মা মনের লুকোনো দেরাজ রোজ রাতে উল্টে-পাল্টে দেখে চুপিচুপি বন্ধ করে রাখেন। যতদিন না নিজের মনের সিন্দুক তারা নিজেরা গোছাতে পারে ততদিন কোনো ছেলে-মেয়ে এই লুকোনো খাতার সন্ধান পায় না।'

এই খাতাটিই হল শৈশব, ওর পাতায় পাতায় স্বপ্ন ভরা।

'অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজ খাতা লুকোনো দেরাজের সন্ধানই পেল না; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই ওই খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে।'

হারিয়ে যাওয়ার কথা যদি বলা হয়, শৈশব আগেও হারানো ছিল, এখনও হারিয়েই আছে। তাকে খুঁজে পায় শুধু শিশুরা আর কিছু ভাগ্যবান, বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা। বড় হয়ে গেলেই শৈশব আবার হারিয়ে যায়।

চিলেকোঠা

মূল কাহিনি ঃ ও. হেনরি
বাংলা অনুবাদ ঃ শুভ্রদ্যুতি সরকার

প্রথমে মিসেস পার্কার আপনাকে দুকামরার অভিজাত ফ্ল্যাটটা দেখাবেন। তারপর শুরু হবে ফ্ল্যাটের আর ফ্ল্যাটের প্রাক্তন বসিন্দাদের গুণকীর্তন। আপনার বাধা দেওয়ার সাহস হবে না। তারপর কোনরকমে হয়ত বলবেন যে আপনি তো আর ডাক্তার নন, ফ্ল্যাটের সঙ্গে লাগোয়া অত বড় চেম্বার নিয়ে আপনার কী হবে। তারপর মিসেস পার্কারের দৃষ্টি দেখে আপনার সত্যিই বিচ্ছিরি লাগবে, মনে হবে আপনাকে ডাক্তার করতে না পারা আপনার বাবা-মার সবচেয়ে বড় অপরাধ অথবা ব্যর্থতা।

এরপর মিসেস পার্কার আপনাকে দোতলায় নিয়ে যাবেন। দোতলার ফ্ল্যাটের ভাড়া সপ্তাহে মাত্র আট ডলার। মিসেস পার্কার আপনাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবেন যে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া আসলে বারো ডলার; এবং পাম বীচে ভাইয়ের কাছে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মিঃ টুসেনবেরী তাই দিয়ে গেছেন; কিংবা প্রত্যেক শীতে মিসেস ম্যাকিন্টার এখানেই কাটান। তাছাড়া এই দামে আপনি যে বিশাল বড় বসার ঘর আর লাগোয়া বাথরুম পাচ্ছেন সেটাও তো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে।

আপনি সবিনয়ে নিবেদন করবেন আরো সস্তা কিছু হলেই বোধহয় হয় ভালো হয়। তারপরেও মিসেস পার্কারের কুঁকড়ে দেওয়া অবজ্ঞা আপনি যদি গায়ে না মাখেন আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে তিনতলার বড় হলঘরে। তিনতলার হলঘর ফাঁকা নয়, মিঃ স্কিডার সেখানকার পুরোনো বাসিন্দা। তিনি সেখানে সারাদিন ধরে বসে যুগপৎ চুরুট সেবন এবং নাটক রচনা করে থাকেন। কিন্তু মিসেস পার্কার প্রত্যেক সম্ভাব্য ভাড়াটেকে একবার মিঃ স্কিডারের ঘর দেখাবেনই। এর ফলে নাকি মিঃ স্কিডারের বকেয়া ভাড়ার কিছুটা হলেও আদায় হয়।

কিন্তু আপনার পকেটে তো তিনটে মাত্র ডলার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা আপনাকে স্বীকার করতেই হয়। মিসেস পার্কারও তখন আপনার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়বেন। মিসেস পার্কারের চীৎকারে পুরোনো বাড়ির জানলা দরজা ঝনঝন করে উঠবে - 'ক্লারা'। তারপরেই আপনার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দুমদুম করে হেঁটে মিসেস পার্কার দোতলায় চলে যাবেন।

ক্লারা মিসেস পার্কারের নিগ্রো চাকরানি। আপনাকে ক্লারার সঙ্গে মই-য়ের মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে চারতলায় যেতে হবে। চারতলাতেই মিসেস পার্কারের সবচেয়ে সস্তার ঘর 'চিলেকোঠা'। ঘরের আয়তন সাত ফুট বাই আট ফুট। চারদিকে পুরোনো জিনিস ডাঁই করে রাখা স্টোররুমের মধ্যিখানে একমাত্র মনুষ্য-বাসোপযোগী ঘর।

ঘরের আসবাব বলতে একটা লোহার খাট, একটা চেয়ার আর হাত মুখ ধোবার বেসিন। মহিলা বাসিন্দাদের জন্য অবশ্য একটা সেল্ফ-কাম-ড্রেসিং টেবিলও আছে। ব্যস, এইটুকুই। আর চারিদিকের দেওয়াল দেখলে আপনার মনে হবে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে উদ্যত হয়ে তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে। গলায় হাত রেখে একবার আপনি শ্বাস নেবেন। মাথার উপর তাকিয়ে আপনি আরো একবার শ্বাস নেবেন। ছাদের ছোট্ট স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে আপনি দেখবেন নীল অসীমের ছোট্ট এক টুকরো।

'দু ডলার, স্যার', ক্লারা তার নিজস্ব বিরক্ত-বিরক্ত ভঙ্গীতে জানাবে।

একদিন মিস লেসন নামের একটা মেয়ে ঘর খুঁজতে এল। মিস লেসন একজন ছোট্টখাট্ট চেহারার মেয়ে। তার ছোট চেহারার সঙ্গে বড় বড় নীল চোখ আর পিঠ উপচে পড়া চুলের ঢেউ বড়ই বেমানান।

যথারীতি মিসেস পার্কার প্রথমে দুকামরার ফ্ল্যাটটা দেখালেন। 'কী সুবিধে বলুন, ওই কোণের আলমারিটায় আপনি ওষুধ-পত্তর, কয়লা এমনকী কঙ্কাল পর্যন্ত...'

মেয়েটা শিউরে উঠে বলল, 'কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই'।

মিসেস পার্কার একবার মেয়েটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখলেন; ডাক্তার ছাড়া এই গ্রহের আর সব প্রাণীর জন্যেই মিসেস পার্কার এই বিশেষ দৃষ্টি বরাদ্দ করে থাকেন।

দোতলার ঘরের ভাড়া আট ডলার শুনে মেয়েটা তো ঘাবড়েই গেল। 'আমাকে কি আপনি কুবেরের বোন ভেবেছেন? শুনুন, আমি একজন খেটে খাওয়া গরীবের মেয়ে। আমাকে আরো সস্তা কিছু দেখান।'

দরজার ঠক-ঠক আওয়াজ শুনে পুরোনো ছেঁড়াখোঁড়া কার্পেটের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা সিগারেটের টুকরো মারিয়ে মিঃ স্কিডার দরজা খুলতে এলেন।

'ও! মিঃ স্কিডার!' মিষ্টি একটা শয়তানি হাসি হেসে মিসেস পার্কার বললেন, 'আপনি ঘরে আছেন বুঝি? আমি এই ভদ্রমহিলাকে আপনার ঘরটা দেখাতে এনেছিলাম।' কিন্তু সেই ছোট্টখাট্ট মেয়েটি, মিস লেসন, একটু মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ঘরটা আমার রোজগারের পক্ষে একটু বেশিরকম ভাল।'

মিস লেসন আর মিসেস পার্কার চলে যাওয়ার পর মিস্টার স্কিডার আবার তাঁর শেষ (অসমাপ্ত) নাটকটা নিয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল নাটকে নায়িকার ভূমিকায় দীর্ঘাঙ্গী মরালগ্রীবা রক্তবর্ণা এক সুন্দরীর থেকে নীল চোখের লম্বা চুলের একজন মিষ্টি চেহারার মেয়েই বোধহয় বেশী মানাবে। 'অ্যানা চরিত্রটা দেখেই লাফিয়ে উঠবে', এই বলেই তিনি আবার সিগারেটের ধোঁয়ার মেঘে ডুবে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত শোনা গেল সেই বিখ্যাত চিৎকার- 'ক্লারা', এবং মিস লেসনের আর্থিক অবস্থা (দুরবস্থা?) সম্বন্ধে আমাদের আর কোন সন্দেহ থাকল না। কালো একটা প্রেতমূর্তি এসে আমাদের ছোট্ট মেয়েটাকে সেই ছাদের ঘরে নিয়ে গেল, ছাদের নীল স্কাইলাইট ছাড়া আর বাকিটা ঘন অন্ধকার।

'দু ডলার', ক্লারার ফিস্‌ফিসে গলা অন্ধকারে শোনা গেল।

মিস লেসন লোহার খাটে ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'ঘরটা নিলাম।'

* * *

সকাল হলেই শীলা (আমরা যাকে মিস লেসন বলে জানি) কাজে বেরিয়ে যেত। রাত্তির হলে একতাড়া কাগজ নিয়ে ফিরে আসত, তারপর টাইপরাইটারে রিবন পরিয়ে খুটুর-খাটুর টাইপ করত। এক একদিন রাত্তিরে শীলার কোন কাজ থাকত না। সেদিন সে অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে ছাদের সিঁড়িতে বসে গল্প করত। বিধাতা যখন শীলাকে তৈরি করেছিলেন তখন মনে হয় 'চিলেকোঠা'র কথা তাঁর মনে ছিল না। এত হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, কল্পনাপ্রবণ মেয়েরা 'চিলেকোঠা'য় থাকবে বলে জন্মায় না।

একদিন শীলা বসে বসে মিঃ স্কিডারের বিখ্যাত (অপ্রকাশিত) নাটক 'ছেলেখেলা নয়, অথবা সাবওয়ের সন্তান' -এর তিনটে দৃশ্য মন দিয়ে শুনেছিল। শীলা সিঁড়িতে এসে বসলেই পুরুষ বোর্ডাররা খুব খুশী হতো। দু'জন মহিলা বোর্ডার অবশ্য ব্যাপারটা একটু ব্যাঁকা চোখে দেখতেন। এদের একজন হলেন মিস. লঙ্‌নেকার, একজন পাবলিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। এঁর স্বভাব ছিল সব কথার উত্তরে বলা- 'তাই নাকি!', 'তাই বুঝি'। আর একজন হলেন মিস ডর্ন - ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কর্মচারী। শীলা বসত সিঁড়ির মাঝের ধাপে, পুরুষরা বসত তাকে ঘিরে। মিস লঙ্‌নেকার উপরের ধাপে আর মিস ডর্ন তলার ধাপে বসে মনে মনে কী ভাবেতন আর কী জাতীয় মুখভঙ্গী করতেন তা উহ্য থাকাই বোধহয় শোভন।

মিস্টার স্কিডারের একান্ত ব্যক্তিগত (অকথিত) রোম্যান্টিক জীবননাট্যে শীলা ছিল নায়িকা। মাঝবয়েসী মিস্টার হোভারের জীবনেও নতুন কল্পনার রং নিয়ে এসেছিল শীলা। অল্পবয়েসী মিঃ ইভানস্ মাঝে মাঝে খুকখুক করে কাশতেন, যাতে শীলা তাকে সিগারেট ছেড়ে দিতে বলে। সকলের মতেই শীলা ছিল সবচেয়ে মিষ্টি, সবচেয়ে হাসিখুশি তরুণী।

সিঁড়ির উপরের ধাপ আর নিচের ধাপের দীর্ঘশ্বাস আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত।

* * *

এইখানে আমি গল্প একটু থামিয়ে মিঃ হোভারের জন্য একটু চোখের জল ফেলতে বলব। আপনারা ভাল করেই জানেন, এ ধরণের গল্পে মোটা (বড্ডবেশী), ধূমপায়ী, মধ্যবয়স্ক লোকেদের কোনও আশা নেই। বেচারা হোভার।

প্রেমিকরা দীর্ঘশ্বাস ফেললে পাঠকরা মেনে নেবেন, কিন্তু ফোঁস ফোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোলে - সর্বনাশ!

স্যরি হোভার, তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। কোনওদিনই তোমার আশা ছিল না।

* * *

একদিন গরমকালে সন্ধ্যেবেলা সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল। মিসেস পার্ক্সরের বোর্ডাররা ছাদের সিঁড়িতে এসে বসেছিল। শীলা হঠাৎ ওপরের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হেসে বলল, 'ওই তো বিলি জ্যাকসন্। আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।'

সবাই আকাশের দিকে তাকাল। বিলি জ্যাকসনকে কেউ খুঁজল আকাশছোঁয়া স্কাইস্ক্র্যাপারগুলোর জানলায়, কেউ বা ভাবল মিঃ জ্যাকসন নতুন কোনও এয়ারশিপের পাইলট।

শীলা আঙুল দিয়ে দেখাল- 'ঐ যে ছোট্ট তারাটা। না না! ঐ বড়টা নয়, ওটার পাশে, ছোট্ট নীল, উজ্জ্বল - একদমই মিটমিট করছে না যেটা। আমার ঘরের স্কাইলাইট থেকেও ওটা দেখা যায়।'

তারপর চারিদিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা পেয়ে বলল- 'আমি ওটার নাম দিয়েছি বিলি জ্যাকসন'।

মিস লঙ্‌নেকার বললেন, 'তাই বুঝি! মিস লেনন যে একজন জ্যোতির্বিদ তা অবশ্য আমরা জানতাম না।'

শীলা বলল, 'ঠিক তা নয়। তবে তারাদের অনেক কথা আমি জানি। আর রাত্তির বাড়লে বিলি জ্যাকসন আমার সঙ্গে কথা বলে'।

মিস লঙ্‌নেকার কাষ্ঠহাসি হাসলেন- 'তাই বুঝি! আমি অবশ্য যদ্দুর জানি তারাটা ক্যাসিওপিয়া ছায়াপুঞ্জের গ্যামা। গ্যামার ঔজ্জ্বল্য মোটামুটি দুই ম্যাগনিটিউড, আর কক্ষপথ...'

মিঃ ইভান্‌স বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখুন মিস লঙ্‌নেকার, আমার মনে হয় গ্যামার থেকে বিলি জ্যাকসন অনেক ভাল নাম'।

'ঠিক কথা', মিঃ হোভার ফোড়ন কাটলেন, 'আর যে কোনও তারাকে মিস লেসন যা ইচ্ছে নাম দিতে পারে।

মিস লঙ্‌নেকার শুধু বললেন, 'তাই নাকি!'

মিস ডর্ন বললেন, 'ওটা বোধহয় উল্কা।'

শীলা বলল, 'এখান থেকে তারাটা ভালো দেখা যায় না। দেখা যায় আমার ঘর থেকে। লোকে বলে কুঁয়োর তলা থেকে দিনের বেলাতেও তারা দেখা যায়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- 'রাত্তিরে আমার ঘর তো কয়লাখনির শ্যাফ্‌ট। যাই হোক, স্কাইলাইট দিয়ে বিলি জ্যাকসনকে দেখে মনে হয় যেন রাত্রির শাড়িতে বসানো একটা জ্বলজ্বলে হীরের পিন।'

* * *

তারপর একটা সময় এল যখন শীলার রাত্তিরে টাইপ করার মত আর কাজ থাকল না। দিনের বেলাও সে আর টাইপ করত না, শুধু এক অফিস থেকে ঘুরে আরেক অফিসে কাজের সন্ধান করত। অফিস বেয়ারাদের রূঢ় প্রত্যাখ্যান তাকে ঠিক কোনখানে বিদ্ধ করত তা বোধহয় মিটিং-ক্লাব-পার্টিতে ব্যস্ত বড়কর্তারা জানতেও পারতেন না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ক্লান্ত শীলা ছাদের সিঁড়ি দিয়ে তার চিলেকোঠার ঘরে যাচ্ছিল। সেদিন তার খাওয়া জোটেনি। ল্যান্ডিং-এ শীলার সঙ্গে মিঃ হোভারের দেখা হয়ে গেল। মিঃ হোভার দেখলেন এই সুযোগ। একগাল হেসে গদগদ ভঙ্গিতে তিনি শীলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। শীলা তাঁকে উপেক্ষা করে উপরে উঠতে লাগল। মিঃ হোভার শীলার হাত ধরতে চেষ্টা করলেন। শীলা তার ক্লান্ত হাতে মিঃ হোভারকে কোনওরকমে একটা চড় কষাতে পারল। মিঃ স্কিডারে হলঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে জানতেও পারল না মিঃ স্কিডার তাঁর নতুন (প্রত্যাখ্যাত) নাটকের নানান জায়গায় সংশোধন করছেন, আর সেই নাটকের নায়িকা সে নিজে।

কোনওরকমে চিলেকোঠায় পৌঁছে বাইরের পোষাক না ছেড়েই শীলা শুয়ে পড়ল - এতই ক্লান্ত ছিল সে। তারপর অনেক চেষ্টায় মাথা তুলে একটু হাসল। স্কাইলাইট দিয়ে বিলি জ্যাকসন তার দিকে তাকিয়ে ছিল- একই রকম স্থির, উজ্জ্বল, নীলাভ দ্যুতিতে ভাস্বর। শীলার চারিদিকের পৃথিবী যদিও অন্ধকারে ঢেকে গেছে, সেই কালিগোলা আঁধারের উপরেও একটা আবছা আলোর ফ্রেমে বাঁধানো হীরে পিনের মতো জ্বলজ্বল করছে বিলি জ্যাকসন। নাকি মিস

লণ্ডনেকারের কথাই ঠিক? বিলি জ্যাকসন নয়, আসলে ওটা ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের গ্যামা, যার ঔজ্জ্বল্য দুই ম্যাগনিটিউড, কক্ষপথ ...

না! শীলা কোনওদিনই বিলি জ্যাকসনকে গ্যামা হতে দিতে পারবে না।

তিনবারের চেষ্টায় শীলা তার দুর্বল হাত তুলে সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে বিলি জ্যাকসনকে একটা চুম্বন উপহার দিতে পারল।

'বিদায় বিলি', দুর্বলকণ্ঠে শীলা বলল, 'লক্ষ-কোটি যোজন দূর থেকে তুমি হয়ত জানতেও পারবে না আমি মরতে বসেছি। তবু অন্ধকারে, যখন আর কিছুই দেখা যায় নি, তোমার স্থির নীলাভ দ্যুতির দিকে তাকিয়ে আমি পথ চলেছি... বিদায়, বিলি জ্যাকসন...'

* * *

সকাল দশটার সময় ক্লারা দেখল মিস লেসনের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচিতে যখন দরজা খুলল না তখন ভেঙে ঢোকা হল। ভিনিগার, স্মেলিং সল্টকিছুতেই মিস লেসনের জ্ঞান ফিরল না। কেউ একজন ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিল।

একটু পরেই দরজায় অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন শোনা গেল। সিঁড়ি দিয়ে ধুপ্‌ধাপ্ করে একজন তরুণ স্মার্ট সপ্রতিভ ডাক্তার উঠে এলেন।

'এখান থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স কল গেছে। কী ব্যাপার?'

মিসেস পার্কার স্বভাবতই বিরক্ত, 'ওহ্ আর বলবেন না ডাক্তার। কী ব্যাপার জানি না, শীলা লেসন বলে একজন ভদ্রমহিলা হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছেন ... কিছুতেই আমরা জ্ঞান ফেরাতে পারিনি ...'

'কোন ঘর?' তরুণ ডাক্তার হঠাৎ ভয়ঙ্কর গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন। তেমন গলা মিসেস পার্কার জীবনে শোনেননি। তিনি ভয় পেয়ে বললেন, 'চি-চিলেকোঠা, ওই...'

মনে হল অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তার ভাড়াবাড়িগুলোর চিলেকোঠা সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। আর একটাও কথা না বাড়িয়ে তিনি একসঙ্গে চারটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকে ওপরে উঠে গেলেন। মিসেস পার্কার এক পা এক পা করে ওপরে উঠতে লাগলেন। তাঁর মত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বময়ী মহিলার পক্ষে যা শোভা পায় আর কী।

সিঁড়ির প্রথম ল্যান্ডিংয়েই অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তারের সঙ্গে মিসেস পার্কারের আবার দেখা হয়ে গেল। ডাক্তারের কোলে শীলার অচৈতন্য দেহটি। ডাক্তার মৃদুস্বরে মিসেস পার্কারকে কিছু বলেছিলেন।

মিসেস পার্কার সারাজীবনে তা ভুলতে পারেননি।

আমরা পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তরুণ ডাক্তার তাঁকে এমন কী বলেছিলেন, যে মিসেস পার্কার এখনও সে কথা মনে পড়লে শিউড়ে ওঠেন।

'যেতে দিন', মিসেস পার্কার বলেন, 'ওইসব কথা শুনে আমার পাপের এক ভগ্নাংশ লাঘব হলেও অনেক বলে মানব।'

অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তারের হাতের বোঝাটিকে দেখে অনেকে ভিড় করে এসেছিল। ডাক্তারের কঠিন মুখ দেখে সে ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল।

'মনে হচ্ছিল লোকটা নিজের মৃতদেহ বয়ে আনছে' -একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমায় পরে বলেছিল।

অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকেও ডাক্তার শীলাকে পাতা বিছনায় শুইয়ে দিলেন না, শুধু ড্রাইভারকে বললেন, 'উইলসন, জলদি!'

উইলসনকে আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না।

গল্প এখানেই শেষ (যদি আদৌ এটা গল্প হয়ে থাকে)। শুধু পরেরদিন খবরের কাগজে একটা ছোট সংবাদের শেষাংশের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি-

'বোর্ডারদের তৎপরতায় দ্রুত মিস লেসনকে হসপিটালে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়। সম্ভবত মিস লেসন দীর্ঘ সময় অনাহারে ছিলেন, এবং পরিণামে সংজ্ঞাহীন হয়ে যান।

ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডঃ উইলিয়ামসন জ্যাকসন বলেছেন রোগিনী ক্রমশ আরোগ্য লাভ করছেন।'

ইঞ্জেকশন

দীপালি ঘোষাল

যে রকম চলছে গাড়িটা, তাতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই সোদপুর পৌঁছে যাবে। ব্যাগটা সযত্নে বুকের কাছে চেপে ধরে সর্বাণী। ইঞ্জেকশনটা অক্ষত আছে তো?

সর্বাণী মনে মনে ভগবানকে ডাকে, হে ঠাকুর আমি ওষুধটা নিয়ে ফেরা পর্যন্ত আমার মাকে একটু বাঁচিয়ে রেখো।

***

সর্বাণী কাপড়ও পাল্টায়নি। কোনরকমে আলমারী খুলে প্রথমে পাঁচশো টাকা নিল। তারপর যদি বেশি লাগে ভেবে আরও শ তিনেক নিল।

মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস ব্যাঙ্ক থেকে কাল দুহাজার টাকা তুলেছিল।

মাথার চুলে দ্রুত চিরুণি চালিয়ে, কোনওরকমে পায়ে চটি গলিয়ে, ব্যাগটা তুলে নিয়ে রওনা দিল সে।

স্টেশনে এসে ট্রেনটা পেয়ে গেল সময়মতোই। শেয়ালদায় নেমেই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল।

কিন্তু কোনও ট্রামে বাসেই উঠতে পারছে না। ভিতরে ঢোকা তো দূরের কথা, পাদানিতে পা রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই। দরজার কাছে যাত্রীরা এমন করে ঝুলছে যে, বাসগুলো কাত হয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেও তার মধ্যে ঢোকে এমন সাধ্য তার হলনা।

ও বুঝল, এভাবে সময় নষ্ট করলে কোনওমতেই চলবে না। মনের মধ্যে তার প্রচন্ড টেনশন হচ্ছে। একটা ট্যাক্সি পেলেও চলত।

একবার ভাবল ফিরে যাবে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে? না! কিউ দিয়ে টার্ন আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

চোখ ছাপিয়ে তার জল আসছে। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে যদি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায়।

না, কোথায় ট্যাক্সি? অফিস টাইম, এখন কি আর ট্যাক্সি মেলে? সব কটাতেই প্যাসেঞ্জার। উপায়ান্তর না দেখে যাত্রী ভর্তি কত ট্যাক্সির সামনে গিয়ে ঝুঁকি নিয়ে হাত দেখাল কতবার। কিন্তু ভাবলেশহীন মুখে চালক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

ভাবল, হাঁটতে শুরু করবে নাকি? ধর্মতলা তো খুব বেশি দূর নয়।

হু হু করে সময় কেটে যাচ্ছে। ট্রেন থেকে নামার পর ইতোমধ্যে আধঘন্টার বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কী করবে ভেবে পায়না সে।

এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল ঠিক তারই সামনে। যাত্রী দুজন নামতে না নামতেই সর্বাণী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্যাক্সির দরজায় হাত রাখল।

ট্যাক্সিওয়ালা ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

সর্বাণী হাঁফাতে হাঁফাতে কোনওরকমে বলল, ধর্মতলা। দে'জ মেডিকেল।

তারপর প্রায় কান্নার সুরে মিনতি করে বলল, দাদা, একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

ট্যাক্সিওয়ালা সম্ভবত ওদিকেই যাচ্ছিল। তাছাড়া ওর প্রয়োজনের গুরুত্বটাও বুঝতে

পেরেছে মনে হল। মিটার ডাউন করে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেল। ভাগ্য ভাল, ওষুধটাও পাওয়া গেল। দাম পড়ল চারশো পঁয়ষট্টি টাকা। ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছিলেন দামটা বেশ বেশি। তবু ওর মায়ের প্রাণের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি নয়?

আসার সময় দেখে এসেছে, মা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। কতবার মা মা করে ডেকেছে সে, চোখবোজা অবস্থায় ঠোঁটটা থরথর করে সামান্য কেঁপেছে মাত্র। হয়তো ভেতরে জ্ঞান আছে, কিন্তু সাড়া দিতে পারছেন না।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বললেন, প্রেসার অত্যন্ত কমে গেছে। শরীরের তাপমাত্রাও দ্রুত নেমে যাচ্ছে। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে উনি বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ইঞ্জেকশনটা দেওয়া দরকার। নাহলে, যেভাবে শরীর ঠান্ডা হতে শুরু করেছে ওকে বাঁচানো কঠিন হবে।

উদ্বিগ্ন সর্বাণী জিজ্ঞেস করেছিল, ডাক্তারবাবু মাকে বাঁচানো যাবে তো?

চেষ্টা তো করছি, কিন্তু এই ওষুধটা ইমিডিয়েটেলি আনার চেষ্টা করুন।

আমি ওষুধ আনছি ডাক্তারবাবু, আপনি যেভাবে পারেন আমার মাকে বাঁচান, মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই সংসারে। একেবারে কেঁদে ফেলে সে।

আপনি শান্ত হন, ইঞ্জেকশনটা ঘন্টা তিনেকের মধ্যে পড়লে হয়ত সারভাইভ করবেন।

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি ডাক্তারবাবু। চাঁপা, তুমি একটু থাকো মায়ের কাছে। অন্য কোনও কাজ করতে হবেনা এখন। ডাক্তারবাবু, আপনি চলে যাবেন না। আমি জীবন-দীপ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই নিয়ে আসছি ওষুধ, চোখ মুছে বলে সে।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, কিন্তু এই ওষুধটা জীবন-দীপ তো নয়ই, এখানকার কোনও দোকানেই পাওয়া যাবেনা। ওষুধটা নতুন বেরিয়েছে।

তাহলে? হতাশ ভঙ্গিতে সর্বাণী ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, আপনি দশটা পাঁচের ট্রেনটা ধরে এক্ষুনি চলে যান কলকাতায়। ট্রেনেই তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন। দে'জ মেডিকেলে পেয়ে যাবেন। এটা ওদেরই প্রোডাক্ট। প্র্যাংক্রশেও পেতে পারেন। হ্যাঁ, অন্তত পাঁচশোটা টাকা সঙ্গে নেবেন। ঠিক কত দাম বলতে পারছিনা, তবে ওষুধটা একটু বেশি দামি। ওই মেয়েটি তো রইলই আপনার মায়ের কাছে। কোনও চিন্তা করবেন না, কোরামিন দিয়ে গেলাম। আমি একঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসছি আবার।

এবার চাঁপার দিকে চেয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, শোন মেয়ে, তোমার না-আ-ম?

ডাক্তার নামটা মনে করার চেষ্টা করেন, মেয়েটি তার আগেই বলে, চাঁপা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ চাঁপা। তুমি হাত আর পায়ের পাতায় একটু ম্যাসাজ করো যাতে গরম থাকে কিছুটা। সাবধান, লক্ষ রেখো স্যালাইনের নলে যেন টান না পড়ে।

ফেরার সময় বাসটা পেয়ে গেল তাড়াতাড়িই। ফাঁকাই ছিল, উল্টোদিকে এখন আর তেমন ভিড় নেই। শেয়ালদায় পৌঁছে দেখে দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি আছে। টিকিট কাউন্টারে লম্বা কিউ। ওখানে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হলে আর ট্রেন পেতে হতনা। ভাগ্য ভাল যে লেডিস কাউন্টারটা প্রায় ফাঁকা ছিল। ও দৌড়তে দৌড়তে এসে ট্রেনে উঠল। তবে ট্রেন পাঁচ মিনিট দেরিতে ছাড়ল।

বাড়ির থেকে বেরিয়েছে দশটারও একটু আগে। এখন বাজে এগারোটা চল্লিশ। ডাক্তারবাবু বলেছেন ঠিক তিন ঘন্টার মধ্যে ওষুধটা পড়া দরকার। প্রায় দুঘন্টা হতে চলল। মা কেমন আছেন কে জানে?

এমনিতে তো ভগবানের নাম মনে আসেনা, কিন্তু এখন আকুল হয়ে জলভরা চোখে সে ঈশ্বরকে স্মরণ করছে। হে ঠাকুর, দয়া কর, দয়া কর। মাকে আমার আর একটু সময় বাঁচিয়ে রাখো।

সামান্য দেরিতে হলেও গাড়িটা ভালই রান করছে। পাঁচটা মিনিট অবশ্য এদেশে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কিন্তু ওর কাছে এখন একটা মিনিটও জীবন মরণ সমস্যা। মনের উদ্বেগে বারে বারে ঘড়ি দেখছে সর্বাণী। একটা করে স্টেশন পার হচ্ছে আর হিসেব করছে আর কত সময় লাগতে পারে। দমদম যখন ছাড়ল তখন ঠিক বারোটা বাজে। দুঘণ্টার বেশি সময় পার হয়ে গেছে। খুব বেশি হলেও আর আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়। তাহলেও ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে। তিন ঘণ্টার আগেই। সময়মতই পড়বে ওষুধটা। ভগবান দয়া করলে মা হয়ত এযাত্রা বেঁচে যাবেন। ওর মন উত্তাল, কিন্তু চারপাশের লোকগুলো তো ওর মনের খোঁজ রাখেনা। আনেকেই হাসি ঠাট্টা শুরু করে দিয়েছে। কতগুলো কলেজের মেয়ে তো তাদের কয়েকজন অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের কথা বলা আর পড়ানোর ধরন নকল করে রীতিমত জমিয়ে রঙ্গ তামাশা জুড়ে দিয়েছে। অন্য বেঞ্চে কয়েকজন চাকুরে মেয়ে শাড়ি গয়না নিয়ে জোর গবেষণা করে চলেছে। ওর ভালো লাগছেনা, কিন্তু কিছুই করার নেই। ওর দুঃখের জন্য তো বিশ্বের সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যাবেনা।

ভগবান যদি দয়া করেন - এই দেখ, আবারও ভগবানের নাম মনে আসছে। মন দুর্বল হয়ে পড়েছে তার। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, আছ, আছ, আছ ঠাকুর? এই মুহূর্তে তুমি খুব বেশি করে আছ। গাড়িটা নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে, অন্তত তুমি সেই দয়াটুকু কর। চাঁপা মাকে ফেলে চলে যাবে না তো? চাঁপা অবশ্য খুবই বিশ্বাসী, আর দায়িত্ববোধও আছে। অনেকদিন ধরে এ বাড়িতে কাজ করছে, ওদের উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে।

সর্বাণী চাকরি করে। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। মায়ের বয়েস পঞ্চাশের বেশি নয়, কিন্তু শরীরটা বিশেষ ভাল নয়। অল্প বয়সে সর্বাণীর জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যেই পরপর দুই নাবালক পুত্র সন্তান মারা যাবার পর, পরের বছরেই এক দুর্ঘটনায় স্বামীকেও হারালেন। শোকে তাপে জর্জরিত হয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অমানুষিক পরিশ্রমে মানুষ করে তুলেছেন একমাত্র জীবিত সন্তান সর্বাণী কে। পরিণামে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেল। দিনরাত মেশিন চালাতে চালাতে পাদুটো প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। সর্বাণীর খুব কান্না পাচ্ছিল, সত্যি মা কত কষ্ট করেছেন সারাজীবন। মা, মাগো বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে তাঁর।

কিন্তু একি! গাড়ির গতি স্লো হয়ে গেল কেন? স্টেশন এসে গেল নাকি? এতো তাড়াতাড়ি? উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে সে। না তো, স্টেশন তো দেখা যাচ্ছেনা। এদিক ওদিক কোনও দিকেই স্টেশনের চিহ্ন নেই। আরেকবার ব্যাগটায় হাত দিয়ে অনুভব করে সে, ওষুধটা ঠিক আছে তো? না, এই তো ঠিক রয়েছে।

সত্যি গাড়ির গতি কমতে কমতে একেবারেই থেমে গেল। একি করলে ঠাকুর! গাড়ি তো আর নড়েনা - যদি ছাড়ে যদি ছাড়ে করে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত ছুটে চলেছে। ছটফট করতে থাকে সে। দেখতে দেখতে আরও আধ ঘন্টা সময় কেটে গেল। এখন সে কী করবে? এক তো এখানে নামা খুবই কষ্টকর, হাত পা ছড়ে তো যেতেই পারে - কিন্তু অত উঁচু থেকে লাফিয়ে নামতে গেলে ওষুধের এম্পুলটা ভেঙে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। একথা ভাবতেই বুকটা কেঁপে ওঠে তার।

নিজের হাত নিজে কামড়ানো ছাড়া এখন আর কী বা করার আছে তার? বেলঘরিয়া

স্টেশনই এখান থেকে অনেক দূর। এখানে তো কোনও উপায় নেই। খোয়ার উপর দিয়ে হাঁটতে গেলে কত সময়ে স্টেশনে পৌঁছতে পারবে কে জানে? তারপরেও তো আবার অন্যকিছু ব্যবস্থা করে সোদপুর পৌঁছতে আরও এক ঘন্টা। এমনও হতে পারে ও হাঁটতে শুরু করল আর ট্রেনও ছেড়ে আগে পৌঁছে গেল। এমন হয়েওছে কয়েকবার।

ও ভগবান! এখন কী করবে সে? এ কি সঙ্কটে পড়ল সে?

উদ্বিগ্ন সর্বাণী লক্ষ করল, অনেকেই, বিশেষ করে ছেলেরা লাফ দিয়ে দিয়ে নামতে শুরু করেছে। সবাই কী সব বলাবলি করছে। সর্বাণীর বুক কেঁপে ওঠে - নিশ্চয়ই কোনও বিভ্রাট হয়েছে। সে মুখ বাড়িয়ে যাকে দেখছে উৎকণ্ঠিত স্বরে তাকেই জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছে দাদা?

কেউ বলছে, ঠিক বলতে পারছিনা - কিছু একটা বড় গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে।

আরেকজন বলল, বোধহয় ইঞ্জিন বিগড়েছে।

একজন হকারকে সর্বাণী প্রায় মিনতি করে জিজ্ঞেস করল, ভাই কী হয়েছে, ট্রেন কি আর যাবেনা? একটু ঠিক করে বলুন না।

হকারটি বলল, দিদি, ওভারহেড তার ছিঁড়ে গেছে। ট্রেন কতক্ষণে যাবে কিছুই বলা যাচ্ছেনা। শুনে সর্বাণীর খুব অসহায় লাগল নিজেকে।

লোকটিকে ও অনুরোধ করল, একটু সাহায্য করুন না ভাই, আমি নামব। ব্যাগটা ওর হাতে দিয়ে বলল, এটা একটু আগে ধরুন, সাবধানে ধরবেন। এতে মায়ের ইঞ্জেকশন আছে।

হকার ছেলেটির সাহায্যে ও কোনওরকমে নামল ট্রেন থেকে।

ছেলেটি বেশ ভদ্র। বলল, কোথায় যাবেন আপনি? সোদপুর শুনে আরও বলল, আপনি দিদি লাইন ধরে হেঁটে বেলঘরিয়া চলে যান। ওখান থেকে যাহোক ব্যবস্থা করে সোদপুর যেতে পারবেন। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে বেলঘরিয়া যাব।

ট্রেন প্রায় খালি করে ততক্ষণে সবাই খোয়ার উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। বহু কষ্টে যখন রোদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেলঘরিয়া পৌঁছালো তখন সারা শরীর দরদর করে ঘামছে। কিছুটা গরমে, কিছুটা উত্তেজনায়। কথা বলার মত অবস্থাও তখন নেই। কিন্তু সেসব ভাবার সময় তার নেই। প্রতিটি মিনিট তার কাছে মূল্যবান। ভাগ্যিস বেশি করে টাকা নিয়েছিল। অটো করে, ট্যাক্সি করে বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছালো। আর ট্যাক্সি যাবেনা সরু গলিতে। ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটা দুটো পেরিয়েছে। সেখান থেকে আবার উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে লাগল। বুক তার ঢিপঢিপ করছে, চার ঘন্টার বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে মাকে দেখতে পাবে তো?

কিন্তু এ কী! বাড়ির সামনে এত লোক কেন? সবাই কেমন চুপচাপ। তবে কি? ত্রস্তে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে চায় সে। সবাই ওকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সরে গিয়ে পথ করে দেয়। কোনও দিকে তাকানোর মত অবস্থা তার নয়।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে আসছেন যে?

আতঙ্কিত কান্নাভরা স্বরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু!

উৎকণ্ঠায় কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গেল তার।

ডাক্তারবাবু শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাকালেন। তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন দুবার।

এমন সময়ে ওর গলা শুনে বেরিয়ে এসে চাঁপা ডুকরে কেঁদে উঠল, দিদি গো, এতো দেরি করলে কেন? আর ওষুধ দিয়ে কি হবে?

যে ব্যাগটাকে বহু যত্নে আগলে রেখেছিল এতক্ষণ, বিহ্বল সর্বাণীর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল, ইঞ্জেকশনটা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল মুহূর্তে।

হবি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিসেস সামন্ত। গৃহবধূ। বাড়ি থেকে বেরনো হয়না বললেই চলে। সংসারের যা ঝামেলা। ভিড় ঠেলে ট্রেন থেকে নামতে গিয়েই চোখে পড়ল। ছেলেটি একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। নিরাপত্তাহীনতাটা হঠাৎ কেমন চাগাড় দিয়ে উঠল। "উনি ঠিকই বলেন, আজকাল সোনার গহনা ..."। আঁচলটা দিয়ে গলার হারটা যথাসম্ভব চাপা দিয়ে দ্রুত পা বাড়ালেন।

রতন ঘোষ। ত্রিশোর্ধ্ব যুবক। প্রথমবার পাত্রী দেখতে চলেছেন সদলবলে। তাও আবার নিজের জন্য। প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন ছেলেটিকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেন। নিজের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বোলাতে গিয়ে টেনসনও বেড়ে গেল। প্যান্টের চেনের কাছটায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন।

ছেলেটি তন্ময়। এই স্টেশন থেকে উত্তরে একটু হাঁটলেই ওর বাড়ি। গতবছর পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পাঠ শেষ করে এখন বাড়িতে। ঘড়িতে আটটা দেখে মনটা একবার ক্লাব-ক্লাব করে শান্ত হয়ে গেল। না, আজ আর ভালো লাগছেনা। সেই তো একঘেয়ে আলোচনা। তন্ময় জানলার পর্দাটা সরিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকালো। পূর্ণিমা আসছে না যাচ্ছে! ঘাড় বেঁকিয়ে চাঁদটা দেখতেই উজ্জ্বল চাঁদটা একটুকরো কালোমেঘে চাপা পড়ে গেল। তন্ময় মুচকি হাসে। "লজ্জা পেয়েছে।"

- তোর এই অদ্ভুত হবির জন্য একদিন 'ক্যাল' খাবি। - যুধিষ্ঠির মন্তব্য করে।

- কেন তেমন পরিস্থিতি তো হয়নি কখনও। - তন্ময় শান্তভাবে জবাব দেয়।

- কি পাস লোকজনকে এভাবে দেখে? -রঘু আগ্রহ দেখায়।

- সে তুই বুঝবি না। আমিই এখনও বুঝিনি অসুবিধাটা কোথায়!

- কিসের?

- এই কাউকে দৃষ্টিতে রাখার ও কারও দৃষ্টিতে থাকার - দুটোরই।

- তুমি যাবে বাবা! লক্ষণ সেরকমই। এর থেকে বিকেলে মাঠে এসো! ভালো থাকবে!

বিকেলে রোজকার মত তন্ময় তার নির্দিষ্ট জায়গাটায় বসে চুলটা ঠিক করে নেয়। আজ তার আসতে দেরি হলেও সাড়ে পাঁচটার ট্রেনটা এখনও আসেনি। ট্রেন আসে। স্টেশনে চাঞ্চল্য বাড়ে। তন্ময় চলমান লোকগুলোর মধ্যে একজনকে খুঁজে নেয়। অনেকভাবে চেষ্টা করেও হলনা। অ্যাটাচি হাতে লোকটা মাথা নিচু করে চলে গেল। একবারও তন্ময়ের দিকে তাকালো না। তন্ময় জুতসই অন্য একজনকে পাওয়ার চেষ্টা করছিল।

- আমায় খুঁজছেন?

তন্ময় চমকে ফিরে প্রশ্নকর্তা যুবতিকে দেখে দেখে বিস্ময়মিশ্রিত অসম্মতি জানায়। - 'না'!

- আমি কিন্তু আপনাকেই খুঁজছি। তাই আমার বিশ্বাস আপনিও আমায় খুঁজছেন।

তন্ময় কেমন অপ্রস্তুত হয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলছিল। হাত মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে জানায়। - "আমি আপনাকে চিনিনা।"

- সেই জন্যই তো। আপনি কি আপনার নিজের বাড়ি খোঁজেন? কিন্তু বন্ধুর বাড়ি, যেখানে আগে যাননি, তা আপনাকে খুঁজে নিতে হতেই পারে।

তন্ময় এই অদ্ভুত যুক্তি ও মেয়েটির মতলব - এই দুইয়ের গোলমালে ফেঁসে শেষপর্যন্ত আপ্রাণ

ছাড়া পেতে চাইছিল। - দেখুন, আমি তো সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম, আপনি এলেন পিছন থেকে। যাদি আমি কাউকে খুঁজেও থাকি তাবে তা সামনের কাউকে।

- এমনই হয়। আমরা বেশিরভাগ সময়েই ঠিক জিনিসটা ভুল জায়গায় খুঁজি, তার ভুল জিনিসটা ঠিক জায়গায় পাওয়া যায় হাতে, আর সেটাকেই ঠিক ভেবে ভুল করি।

- কি মুশকিল! আমি আপনাকে খুঁজিনি!

- আচ্ছা ঠিক আছে। বাব্বা! না খুঁজেই পেয়েছেন। এতে মুশকিলের কী আছে? খুঁজে না পেলে, মুশকিল। না খুঁজে পেলে তো কোনো সমস্যাই নেই।

- আপনি কী চান? - তন্ময় বিরক্তিতে গরম হয়ে ওঠে।

মেয়েটি নরম গলায় আস্তে আস্তে বলে - আপনি এখন চাওয়া-পাওয়ার বাইরে চলে গেছেন। আজ আসি। পরে দেখা হলে চেয়ে নেওয়া যাবে। - তারপর জবাবের অপেক্ষা না করে বাস রাস্তার দিকে চলে যায়।

রাত্রে কথাটা তন্ময় ক্লাবে তুলতেই রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। মিলন কুটিল হেসে বলল - তাহলে স্টেশন চত্তরটাও আজকাল ... কোন দরদস্তুর বলেনি?

তন্ময় প্রতিবাদ করে - তোরা যা ভাবছিস তা নয়। দেখে তো বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলেই মনে হল।

- অমন মনে হয়। তোয়াজ করে ঠিক রাখে। না হলে খদ্দের তো ...

- যা জানিসনা তা নিয়ে ভ্যাজ্‌ভ্যাজ করিস না তো মিলন। - রঘু ধেঁকানি দিয়ে ওঠে।

- ওহ্ sorry তুই তো আবার অভিজ্ঞ লোক। - মিলন ভ্রুকুটি করে। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

- তোরা থামবি! তন্ময় চলে যায়। বাড়ি এসে বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ খুশি নিজেকে দেখে, নিজের সাথে কথা বলে। কোন চাঞ্চল্য নেই। সব নিজের মত করে প্রবাহিত। তবে কি আমার দৃষ্টিনিক্ষেপও যে ঠিক এরকমভাবে অনুভব করে সেই আমার প্রতিকৃতি? তাকে খোঁজার জন্যই কি ...

***

পরদিন বিকেল

- আপনি বুঝি রোজ এখানে এসে বসেন?

- আপনি? - তন্ময় উঠে দাঁড়াতে চায়।

- রাগ করবেন না please! এখানকার সমবায় ব্যাঙ্কে আমি নতুন চাকরি পেয়েছি। ছুটি হয়ে যায় এইসময়। আর বাস তো একঘন্টা পরে।

- কেন? এখন ট্রেনের সঙ্গেই তো বাস আছে।

- আমায় পরেরটাতেই যেতে হয়। বাসস্টপ থেকে আমার বাড়ি অনেকদূর। দাদার দোকান বাসস্টপে - সেটা বন্ধ করে আমায় সাইকেলে নিয়ে যায়।

- ও! তা আমি কী করতে পারি?

- সিকিউরিটি। আপনাদের বাসস্টপটা বিশেষ ভালো নয়। পানের দোকানের ছেলেরা পিছনে লাগে। আপনার সঙ্গে থাকলে নজর দেবে না। তাছাড়া স্টেশন তো ...। আর, একঘন্টা চুপ থাকা যায়? বলুন।

- ও!

- বসব? - মেয়েটি অনুমতির অপেক্ষা না করেই বসে পরে। তারপর তন্ময়ের মুখের দিকেই চেয়ে প্রশ্ন করে - আপনি রোজ এখানে কী করেন?

- টাইম পাস্।

- একা একা?

- একা কোথায়? ট্রেন এলেই কতো লোক।

- তাতে আপনার কী? তারা যে যার মতো চলে যাবে।

- আমি তাতে বিঘ্ন ঘটাই। চুপচাপ দেখতে থাকি কোনও একজনকে। দেখি তার মধ্যে কী পরিবর্তন হল।

- ইন্টারেস্টিং তো, কী পরিবর্তন হয়?

- প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। যে যেটা নিয়ে দুর্বল সেটা প্রকাশ করে ফেলে।

- কেন?

- আত্মবিশ্বাস কম বলে। সমস্ত বিষয়ে সমান আত্মবিশ্বাস আছে এমন লোক নেই বললেই চলে।

- পরিবর্তন হয়না এমন লোকও আছে?

- আছে। তবে হয় তারা আমায় লক্ষ করে না। আর না হয় তাদের দুর্বলতাটা চোখে দেখে ধরার মত নয়। তাদের বুঝতে গেলে কথা বলতে হবে।

- আপনার থিওরিটা বেশ। কিন্তু আত্মবিশ্বাস তখনই আপনার সঙ্গী হবে যদি আপনার স্থির বিশ্বাস থাকে যে যার সঙ্গে কথা বলছেন তার থেকে আপনি বেশি জানেন - অন্তত ওই বিষয়ে। অবশ্য অনেকে ভুল জেনেও চেঁচামেচি করে।

- অচেনা লোক হলে তো প্রথমদিকে সে সুযোগ থাকছে না।

- আচ্ছা, আপনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে পারবেন?

তন্ময় আড়চোখে একবার মেয়েটিকে দেখে আকাশের দিকে চোখ তোলে। শ্রাবণ শেষের বার্তা ছোটবড়ো মেঘে ভেসে যাচ্ছে এদিক ওদিক। তন্ময় অস্ফুটভাবে বলে - হুঁ। তবে ...

- আর কিছু না হোক, অন্তত অন্যান্যদিন যাদের দেখতে আপনি ব্যস্ত থাকেন আজ তারাই আপনাকে একবার দেখে নেবে। - মেয়েটি সহাস্যে মন্তব্য করে।

***

রাত্রে ক্লাবে

মুখের সামনে মেয়ে থাকলে পুরুষ যে কতোটা নির্বোধ হতে পারে তার প্রমাণ তুই। - রঘু তন্ময়কে ভর্ৎসনা করে।

- কেন?

- "সিকিউরিটির জন্য"! তা আগের বাসে চেপে দাদার দোকানে চলে গেলে তো অনেক বেটার সিকিউরিটি। এতে দাদাকে সাহায্যও করা যায়। তোকে যা বোঝালো তাই বুঝে গেলি?

রঘুর যুক্তিতে তন্ময় চুপ হয়ে যায়।

ওদের মধ্যে বাবু আবার প্রেমিক মানুষ। সে কাছে এগিয়ে এসে তন্ময়ের মাথায় হাত রাখে।

- প্রেমে পড়েনি তো? যাকে বলে 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'?

মিলন আপত্তি করে - না খোকা, স্টেশনটা সিনেমার পর্দা নয়। আমি সিওর মেয়েটার কোনো ধান্দা আছে।

রঘু তাতে সম্মতি জানায় - ঠিক। কোনো এমপ্লয়েড মেয়ে কোনো বেকার ছেলেকে লাইফ পার্টনার ভাবতে পারেনা। একটা উদাহরণ দেখা?

ভোলা গুটিয়ে এসেও বলে - কখন কী হয়! বলা যায়?

পরদিন রঘুর যুক্তিটা দেখিয়ে তন্ময় মেয়েটিকে বলে - আপনি তো এই বাসেই যেতে পারেন?

- সবকিছুর পেছনেই একটা যুক্তি আছে, না? কেউ কাঁদলে - কেন কাঁদছে? কেউ হাসলে - কেন হাসছে? এই আমি - কেন আপনার কাছে আসছি? কেন ফুল ফোটে? হাওয়া বয়? সব কারণ জানি আজ আমরা, তাই না?

তন্ময় কথা বলে না।

- আচ্ছা, একমুহূর্তও কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু হয়না? একেবারে অকারণে?

তন্ময় প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে - আপনি কিন্তু আপনার পরিচয়টা এখনও ...

আমি বদিলপুরে থাকি। এখান থেকে বাসে মিনিট পঞ্চাশ। তারপর পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে গ্রাম। আর আমার নাম বলবোনা। কারণ আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে গল্প করবেন আর তারা বদ কথা বলে আমার নামটাকে বধ করবে। তবে আপনার নাম আমি জানি।

- কী করে জানলেন? আমি তো বলিনি!

- ঐ নিচে বাসরাস্তার ধারে পানের দোকানিকে একটা ছেলে আমায় দেখিয়ে বলছিল - "তন্ময় মেয়ে তুলেছে।"

তন্ময় নিজের প্রতিক্রিয়াটা প্রকাশ করার আগেই পরের প্রশ্নের সামনে এসে পড়ল।

- আপনি প্রেম - টেম করেন না, না? দেখেই বোঝা যায়। কখনও কারও প্রতি আকর্ষণও ছিল না?

তন্ময় অসন্তুষ্ট হয়ে বলে - ওই ব্যক্তিগত প্রশ্নটা যদি আমি আপনাকে করি?

- আমি বলব, হ্যাঁ, করতাম। এখন আর করিনা। আমিই ছেড়েছিলাম। একদিন মনে হলো সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্বার্থ জড়িয়ে আছে। ছেড়ে দিলাম। প্রেম করবো, তাও আবার ধান্দায়! বলুন, উচিত?

রাত্রে তন্ময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল জীবনে কতোবার হেরেছে। উচ্চমাধ্যমিকে আট নম্বরের জন্য স্টার না পাওয়া। কলেজে উষসীকে ভালো লাগত, - মৃন্ময় পটিয়েছিল। সর্বোপরি গতবছর স্কুলসার্ভিসে না পাওয়া, প্রতিটার পিছনেই একটা করে মনগড়া কারণ ঠিক করে নিয়েছে। শুধু এখনকার এই আগন্তুক! আমরা ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে সবাইকে চিনি। চেনা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। প্রতিটা সম্পর্কের এক-একটা নাম দিই। তৈরি হয় চাওয়া - পাওয়ার হিসেব। পাওয়ায় কম পড়লে বন্ধন শিথিল হয়। হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ - আরও কতো কী! যুক্তিহীনতাটা কি কখনও যুক্তি হতে পারেনা?

- আচ্ছা, আপনি বাচ্চাদের দেখেন? ওদের ওপর পরীক্ষা করতে পারেন?

- আপনি যবে থেকে এসেছেন সেদিন থেকে আমার লোক দেখার হবি ডকে উঠে গেছে।

- কেন?

- হবি মানুষের একান্ত অফ টাইমের কাজ।

- তাহলে আমি আপনার অফ টাইমটা টপ টাইম করেছি বলুন?

- তা বটে। এখন কিছুটা বুঝতে পারি কেন মানুষ অপরের চোখের সামনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করে। আসলে মানুষ নিজের গোপনীয়তাটা নিজের মধ্যে রাখতেও পারেনা, আবার ভরসা করে কাউকে বলতেও পারেনা। তাই ভয় পায় - এই বুঝি প্রকাশ হয়ে গেল ভুল জায়গায়। আপনাকে বিশ্বাস না করেও সবকিছু বলতে ভয় হয়না, মনে হয়না, সব কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা জন্মায়না।

- সে হয়তো আমি আপনার রাজত্বের লোক নই বলে।

- না, ঠিক তা নয় ...

- আপনি নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে দুঃখ ভাগ করেন না?

- না। কিন্তু তাতে কী?

- এতে আপনাকে নির্ভয়ে অনেক অনেক বিরহ বেদনা উপহার দেওয়া যায়।

- কী রকম?

- এই ধরুন, আমি শেষ কবে নিজের মতো করে বেঁচেছি কে জানে। পড়াশুনায় ভালোই ছিলাম। একদিন হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। অবশ্যই আমার পছন্দের ছেলের সঙ্গে। প্রেম করতাম আগে থেকেই। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম তাকে নয়, তার ছায়ার আশ্রয়টাই ভালোবেসেছি। নিজে বাঁচতে চেষ্টা করলাম স্বাধীনভাবে। বাধা দিতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সব চরমে উঠলো। একদিন ছাড়াছাড়িও হয়ে গেল। এখন হাজার চেষ্টাতেও বাবা-দাদার সংসারের সদস্য হয়ে উঠতে পারলাম না। কতো খরচ করি মন জোগাতে, তবু আগাছার মতই আছি। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবন বলে কিছু নেই, সবকিছুই অর্ধমৃত।

তন্ময়ের কেমন মন খারাপ লাগছিল। একবার শুধু ওর মনে হল যে উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলেছে। মুখে বলল - আবার বিয়ে করেননি কেন? আপনি তো স্বনির্ভর।

- সেটা একান্তই স্বার্থপরের মতো সমঝোতা হবে। আমি করব সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য, আর সে অর্থের জন্য।

- কিন্তু এভাবেই তো জীবন চলে।

- কে বলেছে চলে? হামাগুড়ি দেয়।

ভদ্রমহিলা (!) চলে যাওয়ার পর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময়ের নিজেকে কেমন প্রৌঢ় প্রৌঢ় মনে হচ্ছিল। বৃষ্টি কমতেই সোজা ক্লাবে। গিয়ে দেখল অনুপম এসেছে। অনুপম তন্ময়দের গ্রুপের কনিষ্ঠতম সদস্য। কলকাতার বাড়িতে থাকে। শেকড় এখানে। তাই ছুটি পেলেই চলে আসে। সমস্ত ফূর্তির অর্থ জোগান দেয় সে, নেপথ্যে তার শিল্পপতি বাবা।

তন্ময়কে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল - এই ওয়েদারে তুই বেরিয়েছিস কী রে? তারপর জানাল - অনুপম এসেছে, আজ রাতে একটু খাওয়া ...। অনুপম ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে তন্ময়কে দেখে বলে - তন্ময়দা, তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট করছিলাম। তুমি স্টেশনে কার সঙ্গে বসে ছিলে?

- সে আর বলিস না! বলে আজকের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল তন্ময়।

- অসম্ভব! ও আমাদের স্কুলে পড়েছিল উচ্চ মাধ্যমিকটা। তারপর দেড় বছর হয়েছে। এর মধ্যে বিয়ে, ডিভোর্স ... অসম্ভব!

- কী নাম? - তন্ময় বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

- জানিনা। অন্য সেকশনে পড়তো। একেবারেই আলাপ নেই। আমি স্কুলে দেখেছি। তোমায় মিথ্যা বলেছে নিশ্চয়ই। ওর গ্ল্যামার দেখে বুঝতে পারোনা? আমি শুনেছিলাম খুব ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে।

- সে নাও বোঝা যেতে পারে। কিন্তু মিথ্যা বলবে কেন? - যুধিষ্ঠির সন্দেহ প্রকাশ করে।

- তুই ভুল চিনেছিস হয়তো? আমায় তো কোন্ গ্রামে বাড়ি বলেছিল। - তন্ময় অনুপমকে

উদ্দেশ্য করে।

- সে বাড়ি হতে পারে। কিন্তু আমি ওকে স্কুলে দেখেছি। হানড্রেড পার্সেন্ট সিওর।

- আমার মনে হয় ও তোকে খেলাচ্ছে। - রঘু মন্তব্য করে।

তন্ময় এবার ঋজু হয়ে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে - তাই যদি হয়, তো হোক। এ খেলা আমারও তো এবার ভালো লাগছে।

পরদিন স্টেশনে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল তন্ময়। সে প্ল্যাটফর্মে আবির্ভূত হয়ে সোজা বাস রাস্তার দিকে হাঁটছিল। যেতে যেতে তন্ময়কে একবার হাত দেখালো। তারপর এগোতে লাগলো বাসরাস্তার দিকে। তন্ময় দ্রুত হেঁটে সামনে গিয়ে হাজির হলো।

- বাসের এখনও তো দেরি আছে।

- আমার তাড়া আছে। - মেয়েটি ব্যস্ততা দেখায়।

তন্ময় তার অনিসন্ধিৎসু প্রশ্নগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলনা। তাই সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে ছোটাছুটি করছিল।

- তাড়া থাক। গতকাল -

- মিথ্যে বলেছিলাম।

- আপনার ব্যাঙ্কে চাকরি?

- তাও মিথ্যে। আমি এখানে কলেজে পড়ি।

- শ্যামাচরণে?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ে। বলে,

- তবে আজ সত্যি বললাম। সবগুলো।

তন্ময় থেমে যায়। মেয়েটি চলে যেতে যেতে ফিরে তাকায়,

- আরও একটা সত্যি কথা বলব। সোমবার। থাকবেন কিন্তু।

রবিবারটা তন্ময়ের বড়ো অশান্তিতে কেটেছে। বাবা হঠাৎ ওকে শুনিয়ে বলল - একটা সংসার টানতেই হিমসিম খাচ্ছি, তারমধ্যে আরেকটা সংসার টানতে পারবোনা।

নিশ্চয়ই পাড়ার কেউ স্টেশনে দেখে লাগিয়েছে বাবার কাছে। এই জায়গাটায় তন্ময়ের খুব লাগে। চারপাশে হতাশা। এখানে কিছু নেই, কিছু হবেনা। আলোচনা করলেই পরিবেশ ভারি হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যহ এক অপরিচিতা এক কঠিন ঠাট্টা করছে তাকে নিয়ে। ক্রমাগত বদলে চলেছে আলো-আঁধারের এই খেলার চরিত্র। স্বাভাবিক পথেই কাল একটা নাম দিয়ে দেবে সম্পর্কটার। দরজার সামনে দিয়ে দাদু হেঁটে গেলো। বড়ো ঝুঁকে পড়েছে। তন্ময়ের আশাটুকু ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল।

সোমবার বিকেলে স্টেশনে যাবেনা ভেবেছিলো। কোন্ এক অদৃশ্য টান টেনে নিল তন্ময়কে। বেঞ্চটাতে বসেই নিজের উপর রাগ হল - কী স্বার্থপর আমি! কাল পর্যন্ত যে বোঝা হালকা করছিলো, সে আজ বোঝা হতে পারে - এই ভেবে পিছিয়ে আসছি! এর মধ্যে কখন যে মেয়েটি পাশে এসে বসেছে তন্ময় তা টের পায়নি। উপস্থিতি অনুভব করেই তন্ময় ঘার ঘোরায়। রোজকার চপলতা ও বাক্‌চাতুর্য ভুলে বড়ো শান্ত, স্নিগ্ধভাবে বসেছিল মেয়েটি। তন্ময় এতো নয়নভরে দেখার সুযোগ পায়নি কখনও। শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে - আপনি এতো মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন?

- একটা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

- কী?

- মনের গভীরে একটা অনুভূতি তো দানা বাঁধতে শুরু করেছে, কিন্তু মুখে স্বীকার করতে পারবেন না।

কথাটা তন্ময়ের পৌরুষে আঘাত করে বসল। মনে ভাবল - "কী ভাবে মেয়েটা নিজেকে? আমায় পুরো জেনে গেছে?"

মেয়েটা তার কথা শেষ না করে মুচকি হেসে বলল - "সেদিন আমি বিবাহিত শুনে আপনার মুখের অবস্থাটা যা হয়েছিল। একটা ক্যামেরা থাকলে ...। খুব সহজে আপনি মেনে নেন - যা আপনি মানতে চান।"

- আর আপনার সমস্যা হল আপনি যা মানেন তা অপরকে জোর করে মানাতে চান।

- সে তো আপনার মধ্যে অনেক অনুভূতি আছে যা অপরের প্রভাবে তৈরি। কখনো পৃথক করার চেষ্টা করে দেখবেন আপনার স্বতঃস্ফূর্ত ও ফোর্সড অনুভূতিগুলোকে। দেখবেন কোন্‌দিকে কটা থাকে। সবই ফোর্সড।

- দেখুন, আমি খুব বাস্তববাদী ছেলে। এখানে আমি রোজ সেই বাস্তবটা আরও ভালোভাবে বুঝে নিতে আসি।

- সেই জন্যই তো আপনাকে পছন্দ করা।

- আমি বেকার। একপয়সা রোজগার করিনা।

- এতো ভালো লক্ষণ।

- আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ।

- বাঃ। তা হলে তো পারফেক্ট!

তন্ময় উত্তেজিত হয়ে উঠছিল ধাপে ধাপে।

- তবুও আপনি আমার সঙ্গে ...

তন্ময় এবার বড় করে নিশ্বাস নেয় - কী চান?

- মরতে।

তন্ময় হতাশা ব্যক্ত করে। - জানতাম ... এটাই বলবেন।

- প্রেমে মরতে নয় তন্ময়বাবু প্রাণে মরতে। ডেথ্‌।

- হোয়াট?

- এবং এও জানি যে আপনিও মরতে চান। সাহস পান না।

- সবকিছুর একটা সীমা আছে। ইয়ার্কিরও।

- আমার দিকে ভালো করে দেখুন। আমি সত্যি বলছি। এতদিন আপনার সঙ্গে মিথ্যে অভিনয় করেছি শুধু আপনাকে এইটুকু বোঝাতে যে আপনি মরতে চান।

- আমি মরলে আপনার লাভ?

- লাভ আছে। আমি তো মরবোই। কারণ আমি একবারের জন্যও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঁচতে পারিনি। প্রতি মুহূর্তে বেঁচে আছি কোনও না কোনও কারণে। আমি চেয়েছিলাম অন্তত এক মুহূর্তের জন্য হলেও নিজের খেয়ালে বাঁচতে। আচ্ছা, ভগবান যদি আপন খেয়ালে বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকে, আমরা কেন নিজের খেয়ালে ... অকারণে বাঁচতে পারিনি তো কী হয়েছে? অকারণে মরতে তো পারি। কিন্তু একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমায় পোস্টমর্টেম করবে, আমার চেনাপরিচিত লোকদের পুলিশে হ্যারাস করবে। যদি আমরা একসঙ্গে মরি, তাহলে লোকে ভাববে প্রেমিক-প্রেমিকা। সবাই বিশ্বাস করবে। স্টেশনে আমাদের যারা দেখেছে তারা সাক্ষী। কোন অসুবিধা হবেনা। আজ সাড়ে আটটার ট্রেন, স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে। কেউ থাকবেনা ওদিকটায়। চোখ বুঝে একটা লাফ, ব্যাস!

- আপনার এই ভয়ঙ্কর মজা আমার একটুও ভালো লাগছেনা। আমি মরতে চাই না।

- ওটা আপনার ভ্রম। আপনাকে প্রথমদিন দেখেই বুঝেছিলাম আপনাকে মরণসঙ্গী করা যাবে।

জীবনকে বেশি দেখলেই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাবে। আপনি জীবনকে বেশি দেখেন।

- আপনি থামাবেন এইসব অযৌক্তিক কথাবার্তা?

- অযৌক্তিক? বুকে হাত রেখে বলুন আপনার কখনও ইচ্ছে করেনি আত্মহত্যা করতে?

- সে কোনও হতাশ মুহূর্তে ...। তার মানে এই নয় যে বাস্তবে তা করতে হবে। চারপাশে কতো লোক তো বাঁচার জন্য লড়ছে।

- তার মানে এই নয় যে তারা বেঁচে আছে। কী দেখেছেন এতোদিন ধরে বলুন? - কারও নিরাপত্তাহীনতা, কারও হতাশ, পরাজিত মুখ। একটাও ব্রাইট সাইড দেখেছেন কখনও? আপনি নিজেই জীবিত কম, মৃত বেশি। আপনার মরার সুবিধা অনেক বেশি।

তন্ময়ের চোখ-মুখে রাগ আর বিরক্তি ফুটে উঠছিল। বিরক্তভাবে বলে উঠল - আপনার কি সিন্ ক্রিয়েট করতে খুব ভালো লাগে? এসব করে কী আশা করেন আপনি?

- একটু সাহায্য। মরতে। ভেবে দেখুন - যারা কখনও আপনার নাম করত না, কাল তারা সবাই আপনার নাম নেবে বারবার। বদনামও তো এক ধরনের নাম। যারা আপনার অকর্মণ্যতায় বিদ্রূপ করত তারা সহানুভূতি জানাবে আপনার মৃত্যুতে। প্লিজ।

মেয়েটা তন্ময়ের হাতে হাত রাখে। তারপর চোখ ছলছল করে বলে - "সত্যি বলছি। মেল ট্রেনটা সামনে দিয়েই পাস করে যাবে এখুনি। অবিশ্বাস হয়, দুজনে হাত ধরেই ঝাঁপিয়ে পড়ি চলুন না? মরেই প্রমাণ করব সত্যটা। কেউ বাধা দেওয়ার সুযোগই পাবে না। আসুন।" মেয়েটা অপর হাতটাও তন্ময়ের হাতে রাখে।

তন্ময় হাত সরিয়ে নেয়। - ইউ ম্যাড! - বলতে বলতে তন্ময়ের ঠোঁট কেঁপে ওঠে। - তন্ময়বাবু মনের সুপ্ত ইচ্ছেটাকে আর ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন না। এমন সুযোগ আর পাবেন না। আমার সঙ্গে আসুন।

- হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা। যা! অত করে বলছে।

পরিচিত আওয়াজটা কানে যেতে তন্ময় পিছন ফিরে ক্লাবের বন্ধুদের দেখতে পেল। ভয়ার্ত, উত্তেজিত মুখটায় জোর করে হাসির রঙ লাগিয়ে বলল - "ও, তোরা? আয়। আয়।"

- আমার বন্ধু এরা। - তন্ময় আলাপ করিয়ে দিতে চায়। তন্ময় এখন পালাতে পারলে বাঁচে - "চল্, যাই কোথায় যাচ্ছিস।"

যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে বলে - যাচ্ছি কী রে, তোকে দেখতেই তো এলাম।

তন্ময় সে কথা কানে নেয় না - চল্, যাই।

- কোথায় যাবি? আমাদের সামনে লজ্জা কী রে?

মিলন মেয়েটিকে বলে - সবসময় আপনার কথাই বলে।

তন্ময় এদের সামলাতে পারছিল না। এর মধ্যেই মেল ট্রেনটা শব্দ করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। তন্ময়ের খুব ভয়-ভয় লাগছিল কিছু একটা হয়ে যাবে এই ভেবে। হাতটা অল্প হাতে ঠেকতেই অসম্ভব দুর্বল হয়ে গেল। ট্রেনটা আওয়াজ করে ছুটতে ছুটতে অবশেষে চলে গেল দূরে। চলে গেল তার বন্ধুরাও তাকে এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে রেখে। তারপর কেবলই মৌনমুখরতা।

- কি তন্ময়বাবু? কী ঠিক করলেন? আপনার বন্ধুদের কথা ঠিক হলে তো আপনার মরতে কোনো সমস্যা নেই। সব প্রেমিক বলে - তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি। আপনি সেভাবেই আমার জন্য দিয়ে দেখান।

- স্টপ! একদম চুপ!

- আপনি তো আচ্ছা মানুষ। কাউকে বাঁচতে সাহায্য করবেন না - মানা যায়। তা বলে কাউকে

মরতেও সাহায্য করবেন না?

- আপনার চিকিৎসার দরকার। আর্জেন্ট। আমায় যেতে দিন। লোকজন আমাদের কৌতুক দেখছে।

- ঠিক আছে। আপনার প্রস্তুতির দরকার। একদিন দিলাম, ভেবে দেখুন। কাল রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমিও বেঁচে থাকব। আপনাকে আর জোর করব না। আপনি না এলে আমি একাই ...

মেয়েটা চলে যেতে যেতে আবার বলল - আমি কিন্তু সিরিয়াস তন্ময়বাবু।

বাড়ি ফিরে তন্ময় একটা স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। আচ্ছা পাগলের হাত থেকে বেঁচেছি।

পরদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত সবটাই ঢপ ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল তন্ময়। বোন একটা অঙ্ক দেখাতে এল। বোন চলে যেতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি তন্ময়কে গ্রাস করল। বাবা - তাই শ্রদ্ধা করা। বোন - তাই স্নেহ করা। সম্পর্কের সংজ্ঞা অনুযায়ীই তো অনুভূতি। সবটাই ফোর্সড। তন্ময় আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। অস্বাভাবিক অস্বস্তি লাগছিল। যেন একজোড়া চোখ একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তন্ময়। ঢং করে দেওয়াল ঘড়িটায় ঘন্টা পড়তেই চমকে দেখে সাড়ে আটটা।

"না, মরবেন না!", নিজের মনেই চেঁচিয়ে ওঠে তন্ময়, "স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বাঁচবেন। আমি, আপনি - দুজনেই। সংজ্ঞাহীন সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে। অন্তত একটা অকারণ অনুভূতি খুঁজে পাওয়া যাবেই।

দৌড়ে স্টেশনে এসে তন্ময় বুঝতে পারে সাড়ে আটটার গাড়ি চলে গেছে। তার নিজের পরিচিত বসার জায়গাটায় একটা রুমাল পড়েছিল। স্টেশনের আলোয় মেলে দেখল 'শ্রেয়া' নামটা সাদা সুতোয় তার উপর বোনা। ওহ্! ভেতরের ককিয়ে ওঠা বেদনাটা আত্মপ্রকাশ করল। গোটা স্টেশনটা একবার ছুটে নিল তন্ময়। কাউকে না পেয়ে জি আর পি-র কাছে এগিয়েও কিছু বলতে সাহস পেল না। নিচের পানের দোকানটায় এসে বলল - হারুদা, তোমার টর্চটা একবার দাওনা?

- কী হবে?

- স্টেশনে বাড়ির চাবিটা হারিয়ে গেছে। কেউ বাড়িতে নেই তো, কী বিপদ বলোতো?

- কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় তোর বাবাকে দেখলাম মনে হলো।

- এ্যাঁ! ওহ্! একটু আগেই ট্রেনে তুলে দিলাম। সবাই বিয়েবাড়ি।

- ভাদ্রমাসে?

- না। মানে বিয়ের মতো আর কি।

- ওহ্! চল তাহলে, সঙ্গে গিয়ে দেখি। ঢুকতে পারবিনা বাড়িতে।

- নানা, তোমাকে যেতে হবেনা।

টর্চটা ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টেশনে চলে আসে তন্ময়। তারপর ট্রেনলাইন ধরে হাঁটতে থাকে টর্চটা জ্বেলে। অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকার ডাক। মাঝে একটা লাল কাপড়ের টুকরোকে রক্ত ভেবে চমকে ওঠা। তারপর সব শূন্য। বাড়ি। বিছানা। বিনিদ্র রজনী।

পরদিন সকালে শ্যামাচরণ কলেজে কটাক্ষ। অ্যাটেনডেন্স রেজিস্ট্রার দেখাতে প্রাথমিক অসম্মতি। সব মিললেও শ্রেয়া বলে কোনও মেয়ের অস্তিত্ব মেলেনি। সন্ধ্যে থেকে পথ চেয়ে চেয়ে একটিও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের খবরেও কোনও মহিলার ট্রেনের তলায় কাটা পড়ার সংবাদ না পেয়ে তন্ময়ের সারাদিনের ক্লান্তি কিছুটা লাঘব হয়েছে।

পরদিন সকাল সকাল বদিলপুর রওনা দিল তন্ময়। গ্রামের পারস্পরিক পরিচিতির পরিবেশে শ্রেয়া নামের মেয়েটার বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি। বাড়ি যেতেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দরজা খুলে ঘরে নিয়ে এসে বসায় তন্ময়কে - বোসো এখানে, শ্রেয়া বাথরুমে গেছে।

এর মধ্যে জানলা দিয়ে ছোট-বড় কিছু উৎসুক চোখ তন্ময়কে দেখে নিয়ে আড়াল হয়ে গেল।

- নমস্কার।

তন্ময় চোখ তুলে দেখে ভুল মেয়ের কাছে এসেছে।

- ও স্যরি। আপনি নন। এই গ্রামে শ্রেয়া বলে আপনার বয়সি আর কেউ নেই?

- আমি যতদূর জানি - না। আমার বয়সি কেউ নেই। তবে কেউ যদি তার বাচ্চা মেয়ের নাম রেখে থাকে তবে বলতে পারব না।

সেই থেকে কত খুঁজেছে তন্ময়। স্টেশনে প্রতি বিকেলে হাজির হয়ে কত মেয়ের ওপর চোখ রেখেছে। কত ছোট ছোট মজার ঘটনা ফুটেছে, ঝরে গেছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বছরগুলো পার হয়েছে। তন্ময় বিকেল ছেড়ে সকালের নিত্যযাত্রীদের দলে মিশে গেছে। আজ অফিস থেকে ফেরার সময় চোখে পড়ল তার অতীতের বসার জায়গাটা রেল দপ্তর নতুন পাথর বসিয়ে বাঁধিয়েছে। এ লাইনে লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। ওটাকে ফাঁকা আর দেখাই যায়না। তন্ময় একবার আকাশের দিকে তাকায়। সন্ধ্যে শুরুর নতুন চাঁদটা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে টুপ করে সামনে চলে এল।

- তোমার চোখদুটোয় কী আছে জানিনা। চোখাচোখি হলেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

শুতি তন্ময়ের চোখদুটো হাত দিয়ে বন্ধ করে দেয়। একমাস হল তন্ময়ের বিয়ে হয়েছে। তন্ময় মনে মনে ভাবে - তা বটে, লোকজন আজকাল তার লম্বা দৃষ্টিপাতে একটুও বিব্রত হয়না। মুখে সহাস্যে বলে

- অথচ জানো, একটা সময়ে আমার হবিই ছিল কারও দিকে একভাবে তাকিয়ে তার অস্বস্তিটা রাত্রে মজা করে খাতায় লিখে রাখা।

- অদ্ভুত হবি। একবার আমার দিদির এক ইঞ্জিনিয়ার বান্ধবী আমায় বলেছিল তার কানাডায় এক ভারতীয় চ্যাট-ফ্রেন্ড আছে, যার হবির নাম 'Seperation of natural and forced feelings by making undefined relations'।

- হবি!

তন্ময় থমকে যায়।

- তুমিও অবাক হচ্ছো। হয়তো তোমার হবির কথা শুনে সেও হবে।

শুতি বলতেই থাকে - তোমার সঙ্গে যদি তার একবার আলাপ করিয়ে দেওয়া যেত ...

তারা তিনজন

সৌম্য দ্বিবেদী

কুলিন রাউলি, সিনথিয়া কুপার, ওয়াটকিন্‌স্ - নাম তিনটে চেনা-চেনা ঠেকছে? ২০০২ তে পৃথিবীর বিবেক ঋণী হয়ে রইল এঁদের কাছে। সারা পৃথিবীর 'গভীরতম অসুখ' -এর সময় সঠিক ওষুধ যে শেষ হয়ে যায়নি তা মনে করিয়ে দিলেন এই তিন মধ্যবয়স্কা মার্কিন মহিলা। খ্যাতির পিছনে ইঁদুর দৌড়ে সামিল না হয়েও এঁরা আজ সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে। না, ওঁরা বিজ্ঞানী নন, নন খ্যাতিমান সাহিত্যিক কিংবা বিনোদন জগতের মানুষ, নন বিল্ গেটসের মত বিজনেস টাইকুন কিংবা ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ। তবে? ওঁরা আমার, আপনার মতই, তবে সাধারণের মোড়কে অসাধারণ। আসুন, ওঁদের সঙ্গে আলাপ করে নিই।

অনেক আমেরিকানের মতোই ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর কাছেও একটা কালো দিন। তবে বোধহয় আরও বেশি করে। না, ঐ ধ্বংসলীলায় তিনি হারাননি কোনও আপনজনকে, কিন্তু অসহায় অভিমানে সেদিন তিনি বোধহয় তাঁর নিজের বিবেককেই বিদ্ধ করেছিলেন এই বিপর্যয়ের জন্য নিজের দায়বদ্ধতা এড়াতে পারেননি বলে। কারণ তাঁর হাতেই যে ভার দেশবাসীর নিরাপত্তার। কারণ, তিনি, কুলিন রাউলিও তো সেই নামের সঙ্গে যুক্ত, যে নামের দিকে তাকিয়ে এতদিন সারা যুক্তরাষ্ট্র নির্ভয়ে নিরাপত্তার বিলাসিতায় মগ্ন ছিল - এফ. বি. আই। কুলিন রাউলি এফ. বি. আই-এর একজন অ্যাটর্নি স্টাফ। এফ. বি. আই. তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান - আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকেই যেন আরও বেশি করে তিনি বিব্রত হয়ে পড়ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ত্রুটি ও অদূরদর্শিতায় - বিশেষত তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না কেমন করে ওপরমহল বারবার তাঁর অফিস থেকে জ্যাকারিয়াস মৌসাইয়ের ওপর সন্দেহ অবজ্ঞার সঙ্গে অবহেলা করে গেছে। এই জ্যাকারিয়াস মৌসাই মরক্কো থেকে আমেরিকা এসেছিলেন বিমানচালনা শিখতে। রাউলির অফিসের অনেকদিন থেকেই চোখ ছিল এই ব্যক্তির গতিবিধির ওপর। তাই ২০০১ -এর মাঝামাঝিতেই রাউলি এই লোকটির কম্পিউটার পরীক্ষা করার ওয়ারেন্ট দাখিল করার অনুরোধ পাঠান ওপরমহলে। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেই ওয়ারেন্ট দাখিল করা সম্ভব হয়নি এবং অসাহয়তার বন্দি হয়ে রাউলি ও তাঁর সহকর্মীরা প্রত্যক্ষ করল চেনা শত্রুর অচেনা আক্রমণ - আমেরিকার ইতিহাসের অভূতপূর্ব বিপর্যয়। ৮ মাস পরে এফ. বি. আই. যখন মৌসাইকে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে সন্দেহ করে এই রাউলিকেই ডেকে পাঠালো ওয়াশিংটনে এ বিষয়ে আলোকসম্পাতের জন্য, উত্তেজনায় তখন তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। কী বলবেন তাই লিখতে গিয়ে শুক্রবার থেকে সোমবারের মধ্যে তিনি যা লিখলেন - ১৩ পাতার সেই 'মেমো'য় উজাড় করে দিলেন তাঁর প্রিয় এফ. বি. আই-এর প্রতি তাঁর যাবতীয় ক্ষোভ, অভিমান। whistle blower হওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাঁর ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। খ্যাতির আলোয় আসা, শুধু যে মহান দায়িত্বপালনের কর্তব্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে, সেই কর্তব্যপালনে ওপরমহলের ব্যর্থতা তাঁকে বাধ্য করেছিল এই বিস্ফোরক চিঠিটি লিখতে। তাঁর মিটিংয়ের দিন যথাসাধ্য গোপনীয়তা অবলম্বন করেই FBI ডিরেক্টর রবার্ট মুলার ও সেনেট কমিটির উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি রিসেপশনিস্টের হাতে দিয়ে তিনি যখন ফেরার বিমানে চড়লেন - অনেকদিন পর নিজেকে হালকা লাগল তাঁর। কী করে যে এই চিঠিটি প্রকাশিত হয় তা জানা যায়নি। তবে তার পর থেকেই তিনি, কুলিন রাউলি, যেন হয়ে দাঁড়ালেন FBI -এর public conscience.

দুসপ্তাহ পরে ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের সামনে যখন তিনি বললেন তাঁর নিজের কথা সারা আমেরিকা যেন তাঁর হাত ধরে দেখতে পেল শুধু সততা আর সাহসের জোরে, নিজের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা অস্বীকার করে কী করে সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলা যায়; মাঝারি পদে থেকেও উঁচু পদের ভুলত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়। সেপ্টেম্বর ১১র বিপর্যয়ের পর যখন সারা আমেরিকা তীব্র নিরাপত্তাবোধের অভাবে ভুগছে, এফ. বি. আই. -এর জন্য এই ঝটকাটা খুব দরকারি ছিল।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে ১৯৮৩ সালে যে Worldcom -এর জন্ম হয়েছিল ১৯৯০ -এর মধ্যেই তা আমেরিকার অন্যতম প্রধান পাওয়ারহাউস হয়ে ওঠে। ১৯৯৭ -এ সারা বিশ্ব চমকে গেল যখন স্কট সুলিভানের নেতৃত্বে Worldcom, নিজেদের চেয়ে তিনগুনেরও বড় কোম্পানী M.C.I -কে অধিগ্রহণ করল। ২০০১ -এর শুরুতে Worldcom হয়ে দাঁড়াল আমেরিকার 25th. Biggest Company. এসবের পেছনেই সিন্থিয়া কুপারের অবদান অসামান্য। ১৯৯১ -এ একজন contract employee হয়ে ঢুকে ২০০১ -এর মধ্যেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন Internal Audit -এর সহসভাপতি। ২০০০ -এ টেলিকম কোম্পানির প্রাচুর্যের জন্য Worldcom এর আয় যখন পড়তির দিকে তখনও কুপার জানতেন না তাঁদের কোম্পানি আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অ্যাকাউন্টিং জালিয়াতির শিকার হতে চলেছে। কুপারের ডিপার্টমেন্টের মূল কাজ ছিল Operational Audit, অর্থাৎ কোম্পানির বাজেট স্থির করা ও তার পর্যালোচনা আর Financial Audit, অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল বিখ্যাত Arthur Anderson ফার্মের। যখন গত মার্চে অয়্যারলেস ডিভিসনের একজন কর্মীর কাছে সঙ্কেত পেয়ে তিনি জালিয়াতির গন্ধ পেলেন, তিনি প্রথমেই দ্বারস্থ হন দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্টটেন্ট ফার্মটির। সদুত্তর না পেয়ে গেলেন C.F.O. সুলিভানের কাছে, কোনও আশ্বাস বা আলোকপাত তো দূরের কথা, সুলিভান সোজাসুজি তাকে বললেন এ ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামাতে। বেশিরভাগ অডিটরের পক্ষেই C.F.O, কোম্পানীতে যাঁর স্থান প্রায় দেবতার মত, আর Anderson -এর মতো নামী অডিট ফার্মের কথাই শেষ কথা। কিন্তু তিনি সিন্থিয়া কুপার, তাঁর কাছে "When someone is hostile, my instinct is to find out why"। কুপার, তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে অত্যন্ত গোপনে শুরু করলেন Financial Audit -এর কাজ। রাত্রি জেগে, গভীর সতর্কতায়, প্রায় দুমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁরা আবিষ্কার করলেন, কয়েক বিলিয়ন ডলার operating cost কে capital expenditure হিসেবে দেখিয়ে Worldcom ২০০১ -এ ৬৬২ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিকে, ২.৪ বিলিয়ন ডলার লাভ হিসেবে তুলে ধরেছে। এই অভূতপূর্ব 'আবিষ্কার' যে কুপারকে শুধু বিস্মিত করেছিল তা-ই নয়, গভীর হতাশায় ও অবসাদে ডুবে গেছিলেন এতদিনের বিশ্বাসভঙ্গে এবং স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিত বিপর্যয় দেখতে পেয়ে। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করা তো তাঁর প্রকৃতি নয়। তাই C.F.O. সুলিভান, Worldcom এর controller ডেভিড মায়ার্সের রোষের শিকার, এমনকি নিজের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত অস্বীকার করে শেষ পর্যন্ত কর্পোরেট আমেরিকায় ঘটালেন অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ। ফলস্বরূপ একদা আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিগণিত C.F.O. সুলিভান সর্বোচ্চ ৬৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

এনরনের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। জেফ্রিস স্কিলিং আর অ্যান্ড্রু ফাস্টো-র হাত ধরে স্বাভাবিক গ্যাস পাইপলাইন কোম্পানি যখন হাত বাড়াচ্ছে বিদ্যুত, জল, ব্রডব্যান্ড ক্যাপাসিটি ইত্যাদি নতুন নতুন ক্ষেত্রে শ্যারোন ওয়াটকিনস্ যোগ দেন সেই নব্বই দশকের সেই সোনার

সময়ে। ২০০০ -এ এনরন যখন সপ্তম বৃহত্তম কোম্পানি তিনি তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে। ২০০১ -এ যখন প্রযুক্তি বাজারে এলো অভাবনীয় মন্দা, এনরনও স্বাভাবিকভাবেই শিকার হল তার। এই সময়ে ফাস্টো যখন শ্যারোনকে বললেন বিক্রিযোগ্য কিছু অ্যাসেট বাছতে, সেই সময়েই তিনি দেখলেন ঠগ বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাওয়ার জোগার। কেমন ভাবে অ্যাসেট ভ্যালুয়েশনে জালিয়াতি করে এনরনকে তাঁর কর্তৃপক্ষ ফেলে দিচ্ছে অন্ধকার ভবিষ্যতে। খুব ভালোভাবেই বুঝে যান শ্যারোন কেমনভাবে তাঁদের মত কর্মীদের নিশ্চিত ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে দিচ্ছেন C.E.O স্কিলিং। স্কিলিং -এর সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়া করলে চাকরি যে অনিশ্চিত, তা নিশ্চিত জেনেও প্রস্তুত হতে লাগলেন শ্যারন। এই সময়েই কর্পোরেট বিশ্বকে চমকে দিয়ে পদত্যাগ করলেন স্কিলিং। নতুন C.E.O লে-কে প্রথমদিনই জানিয়ে দিলেন শ্যারোন, "I am incredibly nervous that we will implode in a wave of accounting scandal." কয়েকদিন পর মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের সময়ে তুলে দিলেন সাত পাতার নথি। লে তদন্তের ভার দিয়ে দিলেন Law Firm - Vinson and Elkins -কে। কিন্তু এ যেন সেই 'উলঙ্গ রাজা'র গল্পের মতো। ছোট্ট শিশু বলছে, "রাজা তোর কাপড় কোথায়?" আর মোসাহেবদের স্তুতিবাক্যে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন রাজা। কিন্তু বাস্তব তো মূর্খকে ক্ষমা করেনা। তাই ২০০০-এর অক্টোবরে কোম্পানি ৬০১৮ মিলয়ন ডলার ক্ষতি আর ১.২ বিলয়ন ডলার অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। ২০০২ -এর জানুয়ারিতে, কংগ্রেসের তদন্ত যখন ২০০১ -এর মাঝামাঝিতে লেখা শ্যারনের চিঠি প্রকাশিত হয়, রাতারাতি শ্যারন ওয়াটকিনস্ চলে আসেন প্রচারের আলোয়। আর এনরন? হাউস্টনের সেই জগদ্বিখ্যাত অফিসের জ্বলন্ত E (নামের আদ্যক্ষর) আজ নিলামে বিক্রি হয়ে উধাও!

আপাতদৃষ্টিতে এঁরা বিভিন্নক্ষেত্রের, এঁদের সংবাদপত্রে আসার কারণও এক নয়। কিন্তু এঁদের মধ্যে মিল দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। প্রথমত, তিনজনই মহিলা। কিন্তু এঁদের মধ্যে দুজনই মনে করেন সেটা কোনও বড় ব্যাপারই নয়। আসল মিল হল সত্যকে স্বীকার করে ঠিককে ঠিক, ভুলকে ভুল বলার মানসিকতায়, সাধারণত্বের দুর্বলতা ছেড়ে নিজের বিবেকের নির্দেশ মানার দৃঢ়তায়। এর প্রেরণা এঁরা পেলেন কোথায়? এই তিনজন কেউই কিন্তু পাদপ্রদীপে আসতে চাননি। ঘরের সমালোচনা ঘরেই রাখতে চেয়েছেন। কারণ তিনজনই নিজের নিজের কোম্পানিকে ভালোবেসেছিলেন। এবং এখনও বাসেন নিজেদের সবকিছু দিয়ে। রাউলির স্বপ্ন ছিল, ছোটবেলা থেকেই F.B.I. তে যোগ দেবার। সেই বয়সেই রাউলি চিঠি লেখেন F.B.I. তে এবং জানতে পারেন মেয়েদের স্থান হয়না সেখানে। "I thought to myself, that's stupid. I figured that would change eventually." এবং ফল, রাউলির স্বপ্নপূরণ। এবং নিজের পেশার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে কতোটা, বোঝাতে একটা উদাহরণ দিই। F.B.I কর্মীরা ২০ ডলারের বেশি নিতে পারেননা নীতিগতভাবে। রাউলি কোনও পত্রপত্রিকার ভাড়া করা গাড়িতে রাইড অস্বীকার করেন। যখন জন মিলার নিজের লেখা একটি বই তাঁর কাছে মতামত জানাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, উইলি মিলারকে বইয়ের মুদ্রিত দাম পুরো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরকম সততাই এনে দেয় সেই আত্মশ্রদ্ধা, যা তাঁদের এনে দিয়েছে এই সাহস। মনে পড়ে চাণক্যের কথা? এক চৈনিক পরিব্রাজক এসেছেন চাণক্যের কুটিরে। সন্ধ্যা হয়েছে। চাণক্য একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি পুঁথি রচনা করছেন। অতিথিকে দেখে অপেক্ষা করতে বলে প্রথমে জ্বলন্ত প্রদীপ নেভালেন, অন্য একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে অতিথির সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন। এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞেস করায় চাণক্য উত্তর দেন, আগের প্রদীপটির তেল আসে রাজকোষ

থেকে, কারণ ওটি দিয়ে উনি রাজকার্য করেন। আর এই প্রদীপটি ওঁনার নিজের প্রয়োজনের জন্য। তাই এর ক্রয় হয় ওঁনার নিজের আয় থেকে। এই হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ আমাদের মনে করিয়ে দিলেন এঁরা তিনজন।

আর রয়েছে অসামান্য জেদ। এবার উদাহরণ দিই কুপারের। ছোটবেলায় তিনি একটি হোটেলে পরিচারিকার কাজ করতেন হাতখরচ জোগার করার জন্য। অন্য পরিচারিকারা যেখানে একসাথে ৫টি প্লেট নিয়ে যেতে পারতেন, উনি সেখানে ২টি নিতে পারতেন বলে প্রায়ই বিতাড়িত হবার উপক্রম হত। সুতরাং তিনি ওজন তোলা শুরু করলেন। কয়েক সপ্তাহ পর ওই খাওয়ার দোকানের মালিক স্বীকার করলেন, "You were the worst wetress I ever had, and now you are the best". এই জেদই তাঁকে নিয়ে গেছে এই জায়গায়। কুপাররে জেদেই Worldcom বাধ্য হয় ইন্টারনাল অডিটকে গুরুত্ব দিতে। তাই C.F.O সুলিভান যখন তাঁকে financial audit নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করলেন, তখন তাঁর জেদই তাঁকে বাধ্য করেছে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে।

ভাববেন না এঁরা এখন নিজেদের কর্মস্থলে সকলের প্রশংসা, সমীহ উপভোগ করছেন। রাউলির কাছে ফিরে এসেছে প্রত্যাঘাত। তাঁর কিছু সহকর্মী, কিছু পূর্বতন সহকর্মী তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন আভ্যন্তরীণ খবর বাইরে জনসমক্ষে প্রকাশ করার দায়ে। তাঁর মেলবক্স ভরে গেছে সেইসব চিঠিতে, যেগুলির ভাষা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আপনি, "If you work for a man speak well for him and stand by the institution he represents. Remember - an ounce of royalty is worth a pound of cleverness. If you must browl, condemn and iternally find fault, why - resign your position." সেই বিস্ফোরক তেরো পাতার চিঠির পরেও প্রায় একডজন চিঠিতে তিনি উপরমহলে প্রস্তাব দিয়েছেন আইনগত ও তদন্ত সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে, এখনও তার কোনও আশাব্যঞ্জক সাড়া মেলেনি।

কুপারের অভিজ্ঞতাও মধুর নয়। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুলিভান ও মায়ার্সের বিরোধিতায় চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল Worldcom -এর ৬২০০০ কর্মীর জন্য চিন্তা, যাঁদের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর। "I feel a personal obligation to see this thing to some kind of conclusion." নিজেই জানেন না কী পরিণতি হবে। তবে কর্পোরেট গভর্ণনেন্স (internal audit) -এর বিপ্লবে নৈতিক দায়িত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরে সন্তুষ্ট। বাইরে থেকে প্রশংসা পেলেও কোম্পানির কোনও সিনিয়র অফিসার একবারও তাঁকে ধন্যবাদবার্তা জানাননি। আগে যাঁরা তাঁর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতেন, তাঁরাও এড়িয়ে চলেন তাঁকে। তাঁর নতুন C.E.O -এর নতুন ম্যানেজমেন্ট টিমেও চান্স হয়নি তাঁর।

ওয়াটকিনস্ তো সরাসরি তোপের মুখে পড়েছিলেন। তাঁর বস তাঁর হার্ডড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করেছেন আগেই। ৩৪ তলার মেহগনি অফিস থেকে পদোন্নতি হয়েছে হাড় বার করা লোহার আসবাবে ভরা এক পুরোনো অফিসঘরে। হতাশায় তাঁর স্বীকারোক্তি, "It was a horrible response. There is nothing in there to remind them to remember the Code of Conduct, the vision and values ... I can't believe they looked into firing me." এনরন থেকে ছাঁটাই হওয়া কিছু কর্মী সরাসরি তাঁকেই দায়ী করেছেন এর জন্য। অবশেষে এই নভেম্বরে তিনি এনরনের সঙ্গে নবছরের পুরোনো

সম্পর্ক চুকিয়ে পা বাড়িয়েছেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

মনে রাখবেন এঁরা কেউই সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাননি। রাউলির বাবা ছিলেন শহরের পোস্টম্যান এবং দিনে চোদ্দমাইল হেঁটে তাঁকে চিঠি বিলি করতে হত। চোদ্দ বছর বয়সেই কুপার পড়াশুনার পাশে বাধ্য হয়েছেন ম্যাকডোনাল্ডের মতো খাবার দোকানে কাজ করতে। চোদ্দ বছর বয়সে বাবা মায়ের ডিভোর্স হবার পর থেকে জীবনও সহজ ছিলনা। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই এঁরা পেয়েছেন সেই অমূল্য সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে, যার জন্য কুপার, শ্যারন বলতে পারেন তাঁদের মা-ই তাঁদের শিখিয়েছেন, "Never allow yourself to be intimidated. Always think about consequences of your action." এখনও তাঁরাই তাঁদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাই এই চাকরি চলে যাবার মানে নিজেদের পরিবারের অন্নসংস্থান বন্ধ। তবুও এঁরা পিছপা হননি, কেন? হিরো হবার জন্য? "I'm not a hero, I'm just doing my job", বলেন কুপার। তাই আজকে তাঁদের কর্তব্যবোধ, সততা ও সাহসের স্বীকৃতি হিসেবে, আমাদের প্রায় ভুলতে বসা মূল্যবোধ, নীতিবোধকে আরেকবার বিস্মরণের বালুচর থেকে ফিরিয়ে আনার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, Time ম্যাগাজিন ওঁদের Persons of Year 2002 বলে সম্মানিত করলেন। আসুন, আমরাও ওঁদের স্বাগত জানাই।

(সৌজন্যে Time ম্যাগাজিন)

‘কেমন আছ হে কলকাতা?’

কলিকা চট্টোপাধ্যায়

‘কেমন আছ হে কলকাতা?’
মহানগরী তিলোত্তমা
কার হাতে হাত রেখেছ, অসাবধানে রাস্তা পেরুতে?
ময়দানের কোলে শুয়ে, কার ঘাড়ে গুঁজেছো মাথা?
নেচে উঠেছো রঙীন সোয়েটারে, শীত পড়েছে ভেবে -
ঘামে ভিজে, শুকনো রোদে, রাস্তার ক্রিকেট -
কোন্ দলের হয়ে চেঁচিয়ে ওঠো?
কার মিনিবাস পুড়িয়ে ফেলো, কোন আক্রোশে জ্বলে?
তোমার সখী গণধর্ষিতা দিনে-দুপুরে তোমারি বুকে ...
কার প্রেম যাচ্ছে ভেঙে, রাস্তার ধারের ঝগড়া?
কার ঝুপড়ি গুঁড়িয়ে দিল সমাজসেবার লোকেরা?
কোন্ হকার বেকার হলো -
টিকিটচেকার ঘুষ?
খবর রাখো, গাঁটছড়া কার গলায় দিল ফাঁস?
কেমন আছো হে কলকাতা - কফি হাউসের ভিড়ে?
প্রগতি লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে মেট্রো সিঁড়ি ধরে ...
কেমন আছো হে নেশাখোর কলকাতা -
জমকালো পার্কস্ট্রিট?
কার গিটার গান হয়ে যায়?
কার স্যাক্সোফোনেই বাঁশি?
কোন্ পাগলের মনের কোণে, লুকিয়ে আছে কোন্ মেয়েটার হাসি?
কোন্ স্কুলের ছেলেমেয়ে ওরা, টিউশান সেরে ফেরে?
ব্যস্ততাতে উড়ছে সবাই - যাবে চলে তোমায় ছেড়ে
আমিও এখন অনেক দূরে
এসে গেছি তোমায় ছেড়ে
রেখে এসেছি ছাদের কার্নিশে ঠিকানা বদলের হিসেব।
আসছি ফিরে মাঝে মাঝে, হয়ত মস্ত ভুল করেই
তোমারই খবর নিতে ...

মনের মতো সঙ্গী পেলে

অরীন্দ্রজিৎ চৌধুরী

মনের মতো সঙ্গী পেলে,
যেতেও আমি পারি জেলে;
হতেও পারি ন্যাংটো পেলে
মনের মতো সঙ্গী পেলে।

উড়তে পারি পাখির মতো,
করব শুরু তুকের যতন;
পাড়তে পারি বুশকে ঢিলে,
মনের মতো সঙ্গী পেলে।

গভীর জলে ডুব লাগাব,
হানাবাড়িতে ভূত ভাগাব;
ঝাঁপ লাগাব গরম তেলে,
মনের মতো সঙ্গী পেলে।

আয়না ঘর

শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি একটা আয়নার ঘর বানাবো,
যেটাতে ঢুকলে চারিদিকে শুধুই আমি,
আমার বাঁদিকের আয়নাতে হয়তো
তখন সদ্য ঘুমভাঙা সেই সকালটা
যেটাতে আমি আর আলোমেঘের লুকোচুরি।
ডানদিকের আমি তখন জানালায়,
বাইরে অঝোর বৃষ্টির সাথে
আমার বিন্দু বিন্দু কথা মিলেমিশে একাকার।
পিছনের আয়নাতে আকাশ জোড়া
রামধনুর সামনে আমার কিছু না বলা স্বপ্ন
সামনের আমি সেই সময় হয়তো বা -
একা ছাদে - আকাশে কনে দেখা আলো,
আর ঠিক তখনই উপরে তাকিয়ে দেখব
রাতজাগা আমি ডায়েরিতে মগ্ন ...
কিছু যেন ছিল ...
কিছু যেন আজও আছে,
বাকিটা হারিয়ে গেছে।

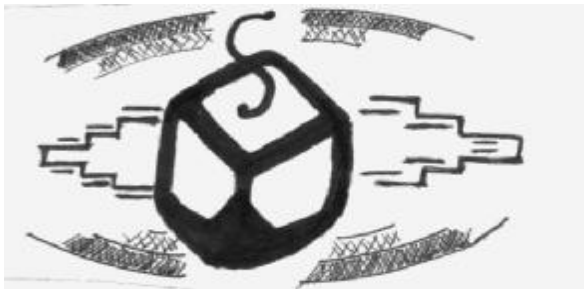

তিনটি কবিতা

অগ্নীশ্বর কুন্ডু

ছায়াবৃত্তে একদিন

আধো সত্তার অধিকারিণী এখনও তুমি,
হাল্কা হাওয়ায় ভেসে আসা পরাগের মতন
বাকিটুকু নিয়ে অস্তিত্ব এখনও বেসামাল এইখানে।
ফ্রেমের ওপার থেকে; ছবির ভেতর থেকে তুমি ডাকো -
ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে সেই খোয়ানো সত্তার ডাক,
তোমার পাতার ছায়ায় বনপোকার ভিজে জালে,
পর্বে পর্বের আর্দ্র ঠিকানায় -
এখনও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কবে সেই সুদিনের সুসময় -
অজ্ঞাত পথের পুনঃপরিক্রমা সেরে,
আবার তোমার সেই পুরানো আঙিনায়,
চেনা ঘর, চেনা দোর -
মন যখন শান্ত হয়ে আসে,
সমুদ্রের কল্লোল যখন থেমে যায় -
শুধু দীপ জ্বলে দীপ্ত হয়ে,
আধারের অস্তিত্ব তখন ম্লান হয়ে আঁধারে বিলায়।

শেষের কবিতা নয়

আমি চেয়েছিলাম একটা শব্দ,
দূর থেকে কাছে এসে,
ক্ষীণ থেকে স্পষ্ট হয়ে,
আমার ঘরের সামনে এসে থেমে গিয়ে,
রুদ্ধশ্বাসে ভেজানো দরজা ঠেলে,
পর্দা সরিয়ে,
মিহি গলায় ঝর্ণার মত জিজ্ঞাসা করুক,
"কেমন আছো?"
আর ঠিক তখনই যদি
ভরদুপুরে সূর্যগ্রহণ হত -
আর দূরের ডালে একটা পাখি সোল্লাসে
শিস্ দিয়ে অধরা হয়ে যেত!
আমার ঘরে
একখানা বই দুটি চেয়ার নেই।

অযোগ্য অথবা অ-যজ্ঞ

আমার চারধারে যখন দাবানল জ্বলছে,
আমার হাতে তখন কমন্ডলু ভরা গঙ্গাজল -
আমার কুন্ডভরা মন্ত্রপূত জল,
অগ্নি নির্বাপণে ব্রতী আমি।

আমি ঋত্বিক বলে জেনে এসেছি নিজেকে,
তাই অনন্ত গ্রীষ্মেও
যজ্ঞের আগুনে ঘি দিয়েছি।
সমাজের সুষুম্না থেকে যত আধুনিক মজ্জা
সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করেছি তাদের -
আশা করি টিকে রবে হিমঋতুভর।

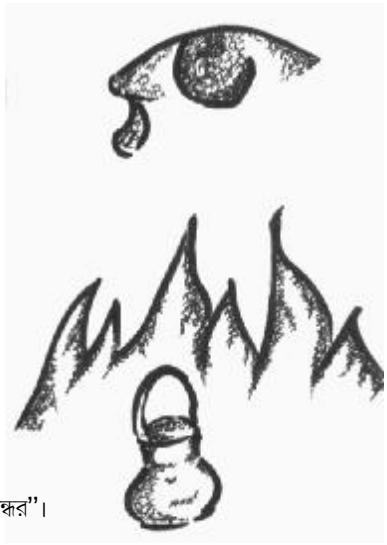

এইসব ভাবতে ভাবতে
ধ্যানের মাঝে ভস্মীভূত হয়ে গেছি আমি।
তবু আমার এখনও বিশ্বাস,
অটুট নাভির ওপর আছে নারায়ণ,
নিরাকার হৃদয়ে তবু অগ্নির আশ্বাস -
বংশধরের করধৃত দীপবর্তিকাপ্রান্তে।

পিতামহ আমায় বরদান করে বলেছিলেন, "যুগন্ধর"।
মরণের পর যুগান্তর হয়ে গেছে!
আগুনঘেরা চোখে আজ আঁধার -
শুষ্ককণ্ঠে ডাকি কাকে, "জল দাও, জল দাও" -
আকাশকে খুঁজি - হায়রে মানুষ,
কত ক্ষুদ্র ছায়ার মতন জীবন তোমার,
ভাবীকাল দেয়নিকো কোনো উত্তর।

আমি এক ভুলের উদ্ধৃতি -
একফোঁটা শিশিরও কি নেই বৈকুণ্ঠে!
যদিও ধরায় এখন বর্ষা চলিতেছে,
তবু খান্ডবে দাবানল নেবেনি কখনও।

ছাঁদবদল

সুমন্ত্র রায়

সকাল ক্রমশ শেষ
দুপুরও ক্রমে ক্রমে ভারী হয়ে এল
এসব কাকের ডাক বাঁধ ভেঙ্গে চালাক ব্যাপারী
আলগোছে জড়িয়েছে কাঁটাতার, বেতাল পাহাড়ি।
প্যাকিং বাক্সের নীচে খ্যাদানো পাপোশ
ভাঙা খাটের নিচে বিবাগী পাথর
গরম মাছ আর দিলদরিয়ার
ছাদ ঢাকা সঞ্চিত বাড়ি,
মানুষ রোদ্দুর ছেঁচে যতকিছু পায়,
মানুষ রোদ্দুর ছেঁচে যতকিছু পায়না কখনো
লরিতে চলিছে সেই বসবাস, সহবাস
হিংসা ও যথেচ্ছ আনাড়ি।
দেয়াল নিয়েছে বোন, বাবা ভিত তুলেছে সংসারী
পরিমিত দুঃখবোধ, জেনে গেছি
কবিতায় ভারি উপকারী।

নির্বাসন পর্ব - ১

নাসিম আখতার

রুটিনের ফাঁকে ফাঁকে আমি রোদ খুঁজে পাই ইলম বা কন্যম টি এস্টেটে
ছায়া খুঁজে পাই ছোট্ট কাঠের বাড়ি, টবে ভরা একচিলতে বারান্দায়
জল খুঁজতে আমি চলে যাই সেবক বাজার কুলকুল তিস্তা
বৃষ্টির কথা মনে পড়লে মিরিকে মেঘের ধনুক থেকে কনকনে ঠাণ্ডা জলের তীর গায়ে বেঁধা
কুয়াশা দেখতে হলে কালিম্পঙে দুরপিন পয়েন্ট - নিজেকে মনে হয় অন্ধ
জ্যোৎস্না দেখি বালাসন পাড়ে বসে।

প্রতিদিন বিকেলে গোধূলি খুঁজে পাই হস্টেলের বারান্দায় থেকে
নির্জনতা খুঁজে পাই ছত্রিশ নম্বর রুমে
খুঁজে পাইনা কোনো মেয়েলি হাত।

হরিষে বিষাদ

হংপাল

মেলা বই

শীত কাল মানেই মেলার সীজন, আর মেলা মানেই বইমেলা। মফস্সলে মফস্সলে শুরু হয়ে গেছে বইমেলা। এরকমই কোনও এক মফস্সল বইমেলায়, যথারীতি বইয়ের দোকানের তুলনায় খাবারের দোকানে (মানে ফুচকা, ভেলপুরি ইত্যাদি) বেশি ভিড়, সুন্দরী সুবেশা যুবতিদের কয়েকটা ঝাঁক এ-দোকান ও-দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের পেছন পেছন কয়েকটি সদ্য গোঁফগজানো ছোঁড়া, বিশেষ কয়েকটি স্টলে, যেখানে 'সচিত্র সহস্র এক আরব্য রজনী', 'সচিত্র সুরভিত উদ্যান' জাতীয় বই রাখা আছে, কমবয়েসী ছেলে ছোকরাদের ভিড়, লিটিল ম্যাগাজিনের স্টল থেকে হাঁকডাক ভেসে আসছে, "এই যে দিদিসোনারা, একবার এদিকে আসুন, দেখে যান ... না এলে আপনি হারাবেন এক অমূল্য রত্ন ..."। মানে আদর্শ মফস্সল বইমেলায় যা যা হয় আর কি!

এ দোকান, সে দোকান ঘুরতে ঘুরতে এক স্টলে দেখি এক সুবেশ দম্পতি। ভদ্রমহিলা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, শেলফে রাখার মতো, ব্রাউন রঙের হার্ডকভার কী রচনাবলি আছে দেখান তো ..." স্টলে শুধু সবুজ রঙের হার্ডকভার রচনাবলি ছিল, দেয়ালের সাথে ম্যাচ করবে না সেটা তাই ওই পুস্তকপ্রেমী দম্পতি পরের স্টলে পা বাড়ালেন, আমিও।

স্টলে স্টলে ঘুরে টুরে দেখি, সব স্টল আলো করে আছেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ, শেষের কবিতা, গীতাঞ্জলি ও সঞ্চয়িতাই সংখ্যায় বেশি। এছাড়া ছোটদের রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা, নাটক সমগ্র আরও কত কী? একটি স্টল বোধহয় পুরস্কার প্রাপ্ত বই ছাড়া রাখেনা। তাদের সব বইয়ের ওপর কাগজের ফ্ল্যাপ, কোনওটায় লেখা বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত, কোনওটায় আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত ইত্যাদি। এবং তাদের পাশে একটি বই ফ্ল্যাপে লেখা, '২০০২ সৃজন পুরস্কারে সম্মানিত'। বইটির নাম: সঞ্চয়িতা, সংকলক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তাহলে মরণোত্তর পুরস্কারও পেতে শুরু করলেন।

বইমেলা থেকে বেরোবার মুখে শেষ স্টলে ঢুকেছি, 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'। টেবিলের উপর সাজানো বই দেখছি, হঠাৎ দুটি স্কুলপড়ুয়া কিশোর ঢুকল। এ বই সে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে

তাদের হাত পড়ল 'রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটগল্প'-এ। দেখেই একজনের প্রশ্ন আরেকজনকে, "কত বই লিখেছে রে লোকটা?"

নানান বানান

সম্পাদক বলেছেন লেখাতে যেন বানান ভুল না হয়। তাই সোজা দোকানে গিয়ে কিনে ফেললুম 'আকাদেমি বানান অভিধান'। তৃতীয় সংস্করণ। ভাবলুম লেখার আগে বানান গুলো একটু 'শাণিয়ে' নিই, ওমা! 'শাণাবো' কী? দেখি 'শাণানো' বানানে মূর্ধন্য ণ নেই, তীক্ষ্ণতা কমে তা 'শানানো' হয়েছে। সত্যি, মূর্ধন্য ণ পাল্টে দন্ত্য ন করায় 'শানিতে'র শাণ কমে গেছে যেন। ভাবলুম আরও দু-চার পাতা উল্টে পাল্টে দেখি। দেখি, 'ব্যবসা' বানান ঠিকই আছে, কিন্তু বাংলার 'ব্যাবসায়িক' সম্পর্কের উন্নতি করতেই বোধহয় একটা আকার পড়েছে। কিন্তু বাঙালির ব্যবহারের তো বিদেশে বেশ খ্যাতি আছে, দেশে না থাকুক, তবে 'ব্যাবহারিক'-এও আকার পড়ল কি খ্যাতি আরও বাড়াতেই? নাঃ! আর না পেরে প্রথমে ফিরে এসে ভূমিকাটা পড়লুম। দেখি এগুলো আকাদেমির নতুন সুপারিশ। আশ্বস্ত হলুম, ছোট থেকেই তাহলে ভুল বানান লিখে আসছি না। আরও ভেবে দেখলুম, ঠিকই বলেছেন এঁরা। বাংলা বানানের সরলীকরণ ও সমতা বিধান করতে গেলে এরকমটাই করা দরকার। এঁদের বানান বিধিও বেশ বিজ্ঞানসম্মত বলেই মনে হল। তবে আমাদের মতো যারা পুরনো বানানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের কাছে বেশ গোলমেলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সমতা বিধানের স্বার্থেই এটুকু করা যেতেই পারে। এরকম একটা মনোভাব নিয়ে আরও কিছু বানান উল্টে পাল্টে দেখলুম এবং তখনই বুঝলুম আসল গোলমাল হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকারে।

বহু বানান যা আমরা দীর্ঘ ঈকার দেখে আসতে অভ্যস্ত, তাতে হ্রস্ব ইকার পড়েছে। 'কাহিনী' কে 'কাহিনি' দেখতে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু 'অবনি', 'ধরণি' দেখে বেশ দুর্বল দুর্বল লাগল, দীর্ঘ ঈকার থাকলে বেশ একটা জোর পাওয়া যায়। হ্রস্ব ইকার হয়ে গেলে ধরিত্রী এতো ভার বহন করতে পারবেন তো? 'মহিরুহ' দেখে মনে হল, কোথা সে 'মহীরূহ', তার তুলনায় এতো চারাগাছ মাত্র। তবে হ্যাঁ, 'যুবতি'টা কিন্তু 'যুবতী'র থেকে ভালো লাগল, 'যুবতি'র মধ্যে একটা কবিতা কবিতা ভাব আছে।

সবই ঠিক আছে, কিন্তু হ্রস্ব ই - দীর্ঘ ঈ কারের দ্বন্দ্ব আমাকে বেশ ধন্ধে ফেলে দিয়েছে। কোথাও দীর্ঘ ঈ দেখলেই বানান অভিধান খুলে দেখে নিতে ইচ্ছে করে। বানান নিয়ে আত্মবিশ্বাস যেটুকু ছিল তা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। এখন যেমন, চিন্তায় পড়ে গেছি, হংপাল বানানে হ্রস্ব ইকার না দীর্ঘ ঈ।

হযবরল

শব্দকল্পদ্রুম

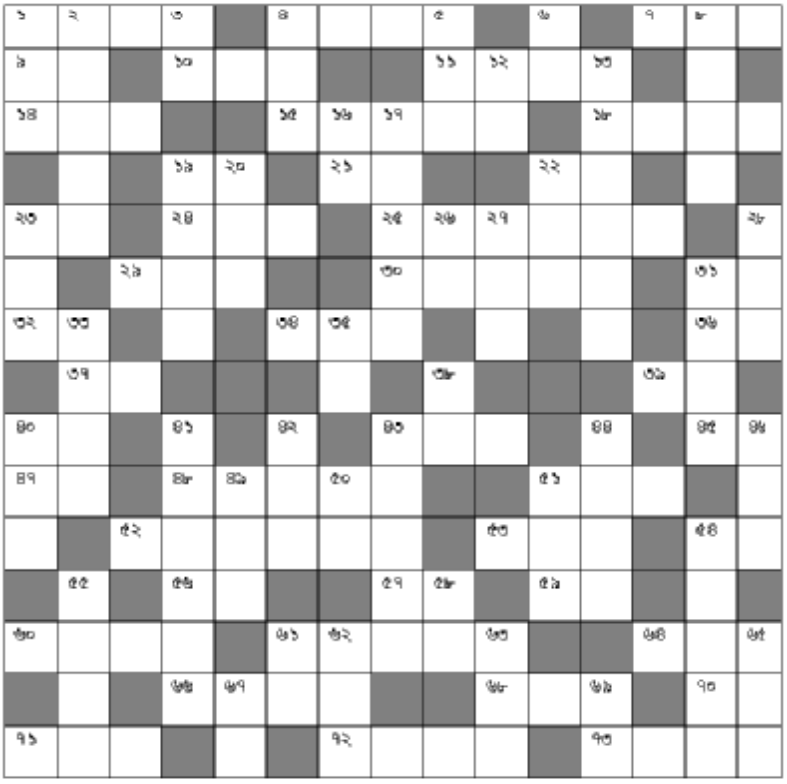

সূত্র ঃ

পাশাপাশি:

১ চিরন্তন
৪ গতযৌবন
৭ অসংলগ্ন বাক্য
৯ পথ
১০ করাত
১১ আকার নেই যার
১৪ ...বনে মত্ত হস্তী
১৫ বারোমাস্যা
১৮ কাজের সাক্ষী
১৯ গোঁ
২১ কুটিল
২২ তেতো
২৩ মহাদেব
২৪ বড়ো কাটারি
২৫ কথাবার্তায় দক্ষ
২৯ রত্ন
৩০ বিপজ্জনক
৩১ জ্ঞান
৩২ বানান ঠিক করতে হলে এই বিধান জানা দরকার
৩৪ বাধা
৩৬ জন্মেছে এমন
৩৭ রমণীয়
৩৯ চেহারা
৪০ প্রমিতি
৪৩ বিষ্ণু
৪৫ স্তন্যপায়ী জলজীবী
৪৭ প্রতিজ্ঞা
৪৮ জলপানি
৫১ সকাশ
৫২ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোয়েন্দা
৫৩ কুরুবংশীয়
৫৪ বিতরণ
৫৬ এই বিবির দয়া হলে ওলাওঠা হয়
৫৭ নিয়ম
৫৯ দক্ষকন্যা
৬০ উত্তরবঙ্গের একটি নদী
৬১ দিগম্বর
৬৪ শ্বাসরোহিত
৬৬ ব্যবসায় এ হয়ই
৬৮ বড়ো লেবু
৭০ সম্মান
৭১ মুখ
৭২ রাজা
৭৩ জন্ম দেওয়া

উপর-নিচ

১ বাকের সহিত
২ দেবমন্দির সংলগ্ন মন্ডপ
৩ রাত্রি
৪ ঝগড়া
৫ কৃশতা
৬ পূর্নিমা
৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বিখ্যাত উপন্যাস
১২ এক ধরনের তাস খেলা
১৩ নানারকম
১৬ ঘুড়ি উড়াবার সুতো
১৭ তালপাতার ভাঁটা
১৯ সাবেককালের জীর্ণারণ্য এখন এই
২০ বেগ
২২ চিহ্ন
২৩ এর জন্যে একক কবিতা লিখেছেন জয় গোস্বামী
২৬ যা চলে গেছে
২৭ উলগুলানের নায়ক
২৮ অজানা
৩১ সমরেশ বসুর বিতর্কিত উপন্যাস
৩৩ যা ত্বরিত হচ্ছে
৩৫ কণ্ঠ
৩৮ তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস
৪০ মায়া
৪১ দারোয়ান
৪২ অক্ষর
৪৩ গরুর চামড়ার তৈরি পাত্র
৪৪ ত্রৈলোক্যনাথ এর স্রষ্টা
৪৬ বন্ধুত্ব
৪৯ হাড়িকাঠ
৫০ শব্দ
৫১ রসালো
৫৪ ঝগড়ারত
৫৫ তাসের একটি রঙ
৫৮ পথিক
৬১ বুক
৬২ সপত্নী
৬৩ এর চাল নবাবী
৬৫ চিন্তন
৬৭ স্বামী
৬৯ ব্রাহ্মণ

ধন্ধমধুর

তৎসম 'ধন্ধ' থেকেই বাংলা ধাঁধা কথাটির উৎপত্তি। তবে বাংলায় শব্দটির অর্থসঙ্কোচন হয়েছে। মূল অর্থে ব্যবহৃত হলেও (স্মরণ করুন 'আমার ধাঁধা লেগে গেছিল') ধাঁধা মানে প্রধানত ভদ্রজনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, তাঁদের মাথা খাটানোর সুযোগ করে দিতে কাগজে কলমে যে সমস্যার নির্মাণ। ইংরেজী puzzle বা brain-teaser আমাদের বাংলা ধাঁধারই জাতভাই।

ধাঁধার প্রকারভেদ আছে। গ্রাম্য, লোকায়ত ধাঁধা, অঙ্কের ধাঁধা, শব্দের ধাঁধা বা শব্দছক এবং আরো বহু বিচিত্ররূপে ধাঁধা সংস্থিত। তবে সব ধাঁধারই আবেদন পাঠকের বুদ্ধির কাছে। আপাতদৃষ্টিতে সোজা মনে হলেও ধাঁধার আসল মজা হলো পেটে-আসছে-মুখে-আসছে-না জাতীয় বৌদ্ধিক দোলাচলের ছন্দে। অযান্ত্রিকের বইমেলা সংখ্যায় এই জাতীয় কিছু ধাঁধা সাজিয়ে দিলাম পাঠকদের জন্য।

এক. জোড়-বিজোড়ের ধাঁধা

অন্যকে অভিনন্দন-অভিবাদন জানানোর জন্য সুভদ্র এবং বিশ্বজনীন পদ্ধতি হলো করমর্দন। পশ্চিম গোলার্ধে এই প্রথার জন্ম, বর্তমানে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে লিঙ্গ-ভাষা-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এর প্রসার।

এখন আমাদের মধ্যে অনেকে করমর্দন করেছেন জোড়সংখ্যক বার, অনেকে বিজোড়সংখ্যকবার। যে সব ব্যক্তি বিজোড়সংখ্যকবার করমর্দন করেছেন (জীবিত-মৃত সকলকে নিয়ে) তাঁদের মোট সংখ্যা কিন্তু জোড়। কেন বলতে পারেন?

দুই. তাসের ম্যাজিক

জাদুকর জ তাসের ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন।

প্রথমে তিনি এক প্যাকেট তাস থেকে চারটে টেক্কা সরিয়ে রাখলেন; বাকী তাসগুলো ক, খ আর গ-এর মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তারপর ক-কে বললেন খ-এর যতগুলো তাস আছে ততগুলো তাস খ-কে দিতে, খ-কে বললেন গ-এর যতগুলো তাস আছে ততগুলো তাস গ-কে দিতে আর সবশেষে গ-কে বললেন ক-এর যতগুলো তাস আছে ততগুলো ক-কে দিতে। এরপর দেখা গেল তিনজনের কাছেই সমসংখ্যক তাস আছে।

জ প্রথমে কাকে কটি করে তাস দিয়েছিলেন?

তিন. উপহার

বড়দিনে মিসেস চ্যাটার্জি তাঁর ছেলে অনলকে উপহার দিলেন একহাজার টাকা, আর মিসেস মুখার্জি তাঁর মেয়ে কমলিকাকে দিলেন দেড়হাজার টাকা।

অনল আর কমলিকা একসঙ্গে হিসেব করতে গিয়ে দেখে দুজনে মোট দেড়হাজার টাকা পেয়েছে। কীভাবে?

চার. জন্মসনের সমস্যা

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঁচকড়ি অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তাঁর জন্মসনের শেষদুটি সংখ্যা আর তার বয়স সমান। সে তার দাদু এককড়িকে সে কথা জানাতে গেল। কিমাতশ্চর্যপরম, দাদুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দাদু আর নাতির জন্ম কত সালে?

খুঁজি খুঁজি নারি

নিচে কয়েকটি সূত্র দেওয়া আছে, সূত্রানুযায়ী ঠিক শব্দগুলি পাশের খোপগুলিতে বসালে গোল খোপে যে অক্ষরগুলি থাকবে সেগুলিকে সাজালে প্রতিটি বিভাগের শেষ সূত্রটির সমাধান পাবেন। শেষ সূত্রগুলির সমাধানের গোল খোপের অক্ষরগুলি নিয়ে আবার একদম শেষের সূত্রটির সমাধান হবে।

চরিত্র:

তৃতীয় ধারার নাটকের স্রষ্টা ○ _ _
'অযান্ত্রিক' বলতে প্রথমে যাঁর কথা মনে পড়ে _ _ _ ○ _ _
মহাভারত খ্যাত সর্প যজ্ঞের হোতা _ _ ○ _ _
'ও আলোর পথযাত্রী ...' _ ○ _ _ _ _
মোহরদি _ _ ○

'সে বলেছে মনে তো নেই' ○ _ _ _ ○

সাহিত্য সংস্কৃতি:

'অমরত্বের প্রত্যাশা নেই ...' ○ _ _ _
'নীরক্ত করবী', 'কলকাতার যীশু' ... _ ○ _ _ _
'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে' _ _ _ ○ _ _ _ _
সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত উপন্যাস _ _ _ ○ .
রবীন্দ্রনাথের দুখজাগানিয়া নাটক ○ _ _ _ _

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের চলচ্চিত্র ○ ○ _ _ _

প্রকৃতি:

'তিনটে ... ঝগড়া করে' _ _ O

আসমুদ্র ... _ _ _ O

মালো পাড়ার কাহিনি আবর্তিত হয় একে ঘিরে _ O _

মানুষ এবং পশুর এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কেবল এখানেই পাওয়া যায় _ _ _ O

কপোতাক্ষের সহোদরা O _ _ _

'... প্রায় জনকদুহিতা' O _ _ _ O

উৎসব:

বিয়েবাড়ির শেষপাতে আইসক্রিম এসে একে প্রায় সরিয়েই দিয়েছে _ O

বর এলো গো, ধান দূর্বা সব সাজিয়ে নিয়ে আয় লো O _ _ _ _

দশমীতে মাকে বরণ করার অন্যতম উপকরণ _ _ O

কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, হংসেশ্বরী _ O _

এর অভাবে রাম নিজের চোখ উৎসর্গ করতে গিয়েছিলেন O _ O _

ভারত, নেদারল্যান্ড, কিউবা _ _ _ _ _ _ _ _

উত্তর ৯০ পৃষ্ঠায়

আজকের থিয়েটার

গৌতম সেনগুপ্ত

'আজকের থিয়েটার' বলতে কী বোঝায়? তাহলে 'গতকালের থিয়েটার' কিংবা 'আগামীকালের থিয়েটার' - এইভাবে থিয়েটারকে চিহ্নিত করা হবে? করা যাবে? সময়ে সময়ে রূপ রীতির বদল ঘটলেও থিয়েটারের আত্মার বদল ঘটে কি? বর্তমান সময়ের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত থাকাই থিয়েটারের কর্ম। কর্মই আত্মা। যে সময়ের, যে দেশের, যে কালের থিয়েটার তার বর্তমানকে যত বেশি করে তার নিজের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছে সে থিয়েটারই ইতিহাসে তত উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। খুঁজলে সারা বিশ্বে এমন অধ্যায় চিহ্নিত করা যাবে। আবার উল্টোটাও সত্য। যখনই থিয়েটার বর্তমানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে কেবল আনন্দবিধানে মত্ত থেকেছে, কিংবা আপন রূপ রীতির গৌরবে সৌরভে মগ্ন হয়েছে, তাতে আত্ম-গরিমা অনুভব করেছে তখনই সে তার অনুজ্জ্বল লজ্জাজনক অধ্যায় রচনা করে আপনার মৃত্যু ডেকে এনেছে। বলা বাহুল্য ইতিহাসে সে কাল থিয়েটারের অন্ধকার যুগ হিসেবেই চিহ্নিত। থিয়েটারের এই উত্থান -পতন অর্থাৎ এই আলোকোজ্জ্বল এবং অন্ধকার ইতিহাসের পেছনে সবচেয়ে বড় যে চালিকাশক্তি তা হল মানুষ। অর্থাৎ থিয়েটার শিল্পী। শিল্পী যখন প্রতিভাবান, সৎ, নিষ্ঠাবান, আপসহীন, উন্নতশির, বিবেকী, অমায়িক, সমাজসচেতন, মানব-প্রেমী, নিজের কথা এবং কাজের মেলবন্ধন ঘটানোর সাধনায় মগ্ন, থিয়েটার যার কাছে নিছক শিল্প আরাধনা নয়, থিয়েটার তার চিৎকার, প্রতিবাদ, তখনই তার হাতে থিয়েটার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অবশ্যই কোনও একজন মাত্র শিল্পীর কাজ নয় এটা। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে সেই সেই সময়ে এমন একাধিক কিংবা একঝাঁক শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে আর তারাই থিয়েটারকে উন্নীত করেছে সেই উত্তুঙ্গ স্তরে। বিপরীতে অন্ধকার যুগ তখনই রাজত্ব করেছে যখন সে সময়ের থিয়েটারকে ধরে রেখেছে ভগ্ন, সংকীর্ণ, আপসকামী, বাক্‌সর্বস্ব, দুর্বিনীত, মানব বিদ্বেষী, বর্তমানকে অবহেলাকারী, আত্মস্বার্থ কেন্দ্রিক প্রতিভাহীন কিছু শিল্পী (?)।

থিয়েটার সবসময়ে আজকের। ভীষণভাবে আজকের। থিয়েটারের মানুষেরা তাই তাঁদের থিয়েটারে আজকের মানচিত্রকে আঁকবেন, ভাঙবেন, গড়বেন, তা নাহলে থিয়েটারে তিনি বাঁচবেন না, বাঁচার অধিকার নেই তাঁর। আজকের কথা বারে বারে আসছে এই কারণে যে, থিয়েটার জীবন্ত শিল্প (Living Art)। এখন এই মুহূর্তে অভিনেতা এবং দর্শক সাধারণ বিশেষ কোনও স্থানে মিলিত না হলে থিয়েটার কর্মটি সংঘটিত হতে পারেনা। থিয়েটারের শর্তই এটা। থিয়েটার ভীষণভাবেই বর্তমানের। তাই বর্তমান যদি থিয়েটারে ঠাঁই না পায়, বর্তমানের যন্ত্রণা, ক্রন্দন যদি থিয়েটারে উঠে না আসে - তাহলে সে থিয়েটার মিথ্যে, ভণ্ড। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে 'পাই টু পাই' সে হিসেব বুঝে নিতে হবে আমাদের। তার জন্য যত নির্মম হতে হয় হতে হবে। এতকাল তো অনেক হল মুখ চাওয়া-চাওয়ি, পিঠ চাপড়ানি। যদি আমরা সাহসী না হতে পারি, সময়ের দাবির পক্ষে (নিরপেক্ষ নয়) দাঁড়াতে না পারি তাহলে থিয়েটার কর্মী হয়ে থাকার মিথ্যা এ অহংকার।

সাধারণ ভাবে অন্য সবকিছুর মত থিয়েটারও অর্থনীতির শিকার। এক একটা সময়ে এক একটা অর্থনৈতিক শাসনের মধ্যেই থিয়েটারকে কাজ করে যেতে হয়। থিয়েটারের কোনও কোনও

মানুষেরা সেই অর্থনীতির দাসত্ব করে, আবার কেউ কেউ তারই বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সব কাজেরই এই দুটো দিক, দুটো রঙ। কেউ আবার বলেন,'শিল্পের জন্য শিল্প। অন্য কোনও দিকে, কোনও রঙে নেই আমরা'। - এরা ভাবের ঘরে চোর। আসলে যে তারা উপরিউক্ত দাস শ্রেণিভুক্ত সে কথা চটকদারি 'শিল্পের জন্য শিল্প'-এর চাদরে ঢেকে রাখতে চায়। বলার অবকাশ থাকেনা যে, এদের থিয়েটার প্রভুর তল্পিবাহক হয়েই থাকে। একটা অর্থনীতি, একটা তোষামোদী রাজনীতি, সংস্কৃতির জন্ম দেয় - একথা যেমন সত্য, তেমন আবার সেই অর্থনীতিকে ভাঙার বিপ্লবী ভাবনারও জন্ম দেয়। এই দুই দিক, দুই রঙ। ভিন্ন কিছু হতে পারেনা। 'আমি তৃতীয়' - এ দাবী যদি ওঠে, তা হলে বুঝতে হবে হয় সে বদ্ধ উন্মাদ, নয়তো সমাজের অহিতকারী শয়তান।

একটা দেশের অন্য ক্ষেত্রের মত থিয়েটারেও এসব ছিল, আছে, হয়তো বা থাকবেও। কিন্তু সব সময় একই রকম ভাবে রঙগুলো উঠে আসেনা, প্রতিভাত হয়না। তাই তা সাধারণের চোখ এড়িয়ে যায়। সময় ক্রমে জটিল হচ্ছে। মানুষও নিজেকে জটিল করে গড়ে নিচ্ছে। শৈশব থেকে আর কিছু না হোক কথায়, কাজের কৌশলী হয়ে উঠছে শিশু। গত পঁচিশ - তিরিশ বছর ধরে বেড়ে ওঠা শিশুরাই আজকের থিয়েটারের কর্মী হয়ে উঠছে। আর কষ্টের হলেও সত্য, এই আত্মকেন্দ্রিক কৌশলী সময়ের সঙ্গে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছেন এমন প্রৌঢ়-বৃদ্ধ থিয়েটার কর্মীরা ঐ যুবকদের পাশে দাঁড়িয়ে সময়ের আঁচ বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকা বিপথগামী থিয়েটারে মদত দিয়ে যাচ্ছেন। এ সময়ের বাংলা থিয়েটারের দিকে তাকালেই এসব বোঝা যাবে।

বার বার শহুরে থিয়েটার থিয়েটারের দাদা হয়ে থেকেছে। এর পেছনেও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণ বর্তমান। ফলত শহরতলি বা গ্রামের থিয়েটার হিসেবে বহির্ভূত থেকে গেছে। থেকে গেছে বড়জোর করুণার পাত্র হয়ে। আলোচনার খাতিরে সেই শহরের থিয়েটারেরও যদি একটু পেছনের দিকে তাকাই তাহলে সময়কে ছুঁয়ে যাওয়া থিয়েটার পেয়ে যাব। 'নবান্ন' -র কথা যদি বাদ দিই, এমনকি 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র', 'রক্তকরবী' , 'অচলায়তন', 'কল্লোল', 'মানুষের অধিকারে', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' এসবও বাদ দিয়ে তার পরের সময়কেও যদি দেখি তাহলেও থিয়েটারে বর্তমান সময়ের প্রতিফলন দেখতে পাব। এই তো সেদিনকার কথা - সত্তর এবং আশির দশকের গোড়ার দিকের কথা। 'বাকি ইতিহাস', 'তিন পয়সার পালা', 'হে সময় উত্তাল সময়', 'জন্মভূমি', 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'রাজরক্ত', 'চাক ভাঙা মধু', 'মারীচ সংবাদ', 'জগন্নাথ', 'সাজানো বাগান', 'দান সাগর', 'অমিতাক্ষর', 'আন্তিগোনে', 'পাপ পুণ্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', (সব নাম স্মরণে না থাকার জন্য দুঃখিত) ইত্যাদি থিয়েটারের মধ্যেও সময় সোচ্চারে উঠে এসেছে। এ সময়ে থিয়েটারের ওপর প্রশাসনের রোষদৃষ্টির কারণে কলকাতা, উত্তরপাড়া ও আরও কিছু জায়গায় থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া, কর্মীদের মারধোর করা, মহড়া কক্ষে ভাঙচুর করা এসব ঘটনা ঘটেছে, ১৯৭৪ সালে কলকাতার কার্জন পার্কের মুক্তমঞ্চের নাটকের তছনছ করে প্রশাসনের পুলিশ বাহিনী হত্যা করেছে প্রবীর দত্তকে। তার বিরুদ্ধে তৎকালীন জরুরী অবস্থার কানুনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঐ কার্জন পার্কেই প্রবীর স্মরণে সমবেত নাট্যানুষ্ঠান করা হয়েছে। এসব ইতিহাস থেকে একথা স্পষ্ট যে, থিয়েটার সময়কে ধরতে পেরেছিল বলেই তাকে নানা আঘাত সইতে হয়েছে।

এরপরে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। এক, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন; দুই, টিভির আগমন এবং তার দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনা। প্রশাসনিক পরিবর্তনে একদল থিয়েটার কর্মী

ভাবতে শুরু করলেন বিপ্লব শেষ, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়ে গেছে, অতএব থিয়েটারে প্রতিবাদী স্বরকে গুডবাই জানানো যেতে পারে। ফলে উক্ত কর্মীতে - সরকারে বন্ধুত্ব গাঢ় হল। এসব কর্মীরা সাংস্কৃতিক নানামহলে উচ্চপদ পেলেন, পেলেন সম্মান, ইজ্জৎ - ছেঁড়া ব্যাগ কাঁধে নিয়ে যা তাঁরা কল্পনাই করেননি কোনওকালে। সরকারি থিয়েটার হলগুলির জমিদারিও এই বিশ্বস্ত বন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়া হল। তাঁরা এগুলি দেখভাল করেন। লক্ষ রাখেন যাঁরা গোটা ব্যাপারটার ছত্রছায়ার বাইরে থাকেন, দাদা-থিয়েটার কর্মীদের 'দাদা' বলে বাড়তি সম্মান দ্যান না বা তাঁদের প্রদর্শিত পথে থিয়েটার করেন না তাঁরা যেন হলে ডেট - টেট্ পেয়ে না যান, পেয়ে না যান সরকারি নাট্যোৎসবে অভিনয়ের সুযোগ কিংবা অন্য কোনও ধরনের সরকারি আনুকূল্য। এরাই এখন বাংলা থিয়েটারের নীতিনির্ধারকের মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ। যেহেতু এই পরিবর্তিত অবস্থায় নেই সরকারি ঢিলেমি বা দীর্ঘসূত্রিতা, নেই খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্যে কোনও অন্যায় বা অব্যবস্থা, নেই পুলিশী বা আইনি জোরজুলুম, নেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অত্যাচার, নেই বেকারির যন্ত্রণা সেহেতু থিয়েটারে এখন ব্যক্তি সংকট উঠে আসা দরকার, চাই মূল্যবোধের থিয়েটার। যেমন মূল্যবোধের রাজনীতি। ফলে থিয়েটার গেল পাল্টে। টিভির সিরিয়ালি ঢং রাজ্যবিস্তার করতে লাগল থিয়েটারী অন্তরে। যারা এতকাল দু-লাইন লিখতে কুণ্ঠিত ছিল সেই বুর্জোয়া দৈনিক খবরের কাগজগুলো এসব থিয়েটারকে সাদরে কোলে তুলে নিল। নানা ধরনের অনুষ্ঠানে টিভির পর্দায় এসব থিয়েটারের কর্মীদের মুখগুলো ভেসে উঠতে থাকল, ফলে এই সকল পরিচালক, অভিনেতাদের ঠাট বাট আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। চান্স হল সিরিয়ালে, সিনেমায়, বাহন হল চার চাকা, হাতে উঠল মোবাইল। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার যুগে প্রচার, প্রসারের সুযোগটা তাদের প্রতিপত্তিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো উল্লম্ফনের গতিতে। সেই 'জয় বাবা মিডিয়া'র কল্যাণে দু-একটা নাটক করেই দুগ্ধপোষ্যরাও পাড়ি দিলেন আমেরিকা, ইংল্যান্ডে। সবদিক থেকেই আর পায় কে এসব থিয়েটারের কর্মীদের। সাংঘাতিক শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও শম্ভু মিত্র, অজিতেশরা সারা জীবনে যা পাননি, লজ্জাজনক শক্তিহীন হয়েও এই সব দাদারা তার চেয়ে শতগুণ খ্যাতি-অর্থ পেয়ে গেলেন। এ কি তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন? ফলে গালের দাড়ির রঙ পাল্টালে এত দিনের সযত্নলালিত ভেতরের রঙও গেল পাল্টে। নিজেরাই আর চিনতে পারেন না নিজেদের।

সেই যে একটা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বোধে মিলিত হওয়া, একদল ছেলে মেয়ে, পরিচালক থেকে নবীন সদস্য পর্যন্ত দলের প্রত্যেকের সম অধিকারের গণতান্ত্রিক বাতাবরণ; পরস্পরের হার্দিক সম্পর্ক সব মিলে একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াকু থিয়েটার দল গড়ে তোলার রক্ত ঢালা প্রয়াস - বহু ক্ষেত্রে সেসব ভেঙে টুকরো টুকরো হতে থাকল। এখন দল নয়, নীতি নির্ধারণ করেন দাদা, (শুধু পরিচালক নন প্রকৃত অর্থে (?) দল নেতা) দল চালান তিনি একা। আলাদা গদিতে বা চেয়ারে বসেন তিনি, আলাদা টিফিনের প্যাকেট তাঁর, আলাদা টোব্যাকো। তিনি অভিনয় থেকে শুরু করে সকল কাজে তাঁর স্বামী / স্ত্রী, ভাই, শ্যালক, পুত্র, কন্যা, জামাতা এবং ভক্তকে (অন্ধ) দলে উচ্চাসন দেন। অন্য কেউ ট্যাঁ-ফোঁ করলে তার লঘু পাপে গুরু দণ্ড - দল ছাড়তে হয়।

অধুনা - নাট্য - দল কথা অমৃত সমান
অর্বাচীন দাস কহে ... ইত্যাদি ইত্যাদি ...

থিয়েটারের ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটে চলেছে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে। আমরা সাংঘাতিক অনুকরণপ্রিয়। জানিনা সকল দেশের সকল মানুষেরই ধর্ম কিনা এটা। কি শহর কি মফস্সল

সবজায়গার থিয়েটারদল ঐ সিরিয়াল মার্কা নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকল। কিংবা দাদাদের অনুকরণে তাদের প্রদর্শিত পথে সময়-থেকে-মুখ-ঘুরিয়ে-থাকা বিষয় নিয়ে বা লোকদেখানো প্রতিবাদী (যা বড় কাগজের হাউসের বিক্রির খোরাক হল) বিষয়কে মঞ্চে হাজির করল। শুধু নাটকেই নয় এই ছোট ছোট থিয়েটারদলগুলো চলনে বলনেও দাদাদের অনুকরণ করতে থাকল। বিপ্লবীয়ানার মুখোশে ঢেকে রাখা দাদাদের মুখগুলো চেনা দুরূহ বই কি। লড়াই-এর ভেতর দিয়ে উঠে এলে হয়তো চেনা খানিকটা সহজ হত এদের। কিন্তু আজকের যুবক - থিয়েটারকর্মীদের সে পথ অতিক্রম করতে হয়নি। থিয়েটারের মাটিতে জন্মেই তারা দেখেছে মূল্যবোধের (?) থিয়েটার, দেখেছে টিভির হাতছানি, পেয়েছে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে আসা থিয়েটারের কর্মীদের। এই অবস্থায় দাদারা এসে যখন তাদের পিঠে হাত রাখছেন, তাদের নাটকের (নাটকই হয়তো হয়নি) উচ্চ প্রশংসা করছেন, (সেসব বাণী মাল বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপনের কাজে লাগছে) কলকাতার সরকারী - বেসরকারী উৎসবে, অনুষ্ঠানে তাদের অভিনয়ের সুযোগ দিচ্ছেন, কখনো নিজের দলের মেজদা, ছোড়দাকে পাঠিয়ে বা নিজে গিয়ে কোনও নাটক তুলে দিয়ে আসছেন, কলকাতার হলে ডেট পাইয়ে দিচ্ছেন তখন দাদাদের ব্যাপারে আপ্লুত হবার যথেষ্ট কারণ থাকছে, থাকছে ভাইদের কাছ থেকে পুজো পাবার কারণ। ঐ যে বলছিলাম কখনও কখনও রঙ চেনা যায়না। গিরগিটিদের রঙ চেনা কি সহজ? হ্যাঁ, এটা সেই সময়। এবং এটাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবারও সময়। এই সুবিধাভোগী (প্রিভিলেজ্‌ড ক্লাস) দাদা - থিয়েটারকর্মীরা, যাঁরা চাইলেই হল পান, অর্থ পান, অভিনেতা অভিনেত্রী পান, সরকারী আনুকূল্য পান, স্পনসর পান, শো পান, নিজেদের মনোমতো কাগজে রিভিউ এবং টিভিতে কভারেজ পান, তাঁরা তাঁদের থিয়েটারকে তবু বাঁচাতে পারছেন না। হাতে গোণা দু তিনটি দল ছাড়া অন্য দলগুলি প্রায় প্রতি শোতে মাছি তাড়ান। দল চালাতে হিমসিম খান। কটা শো হয়ে যাবার পরে দাদাদের হলের অবস্থাও ইতর বিশেষ নয়। দলের অবস্থাও খুব উৎসাহজনক নয়। এই যে ছোটদের প্রেম বিলানো, এই যে দল বল নিয়ে হঠাৎ মাঠে ঘাটে নেমে আসা (যে নাট্যচর্চা গত তিরিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল এবং যা বেশ কিছু নাট্যদল এখনও অবিচ্ছিন্ন ভাবে করে চলেছে) - এ সবই তাঁদের অন্তঃসারশূন্য চিন্তার প্রতিফলন এবং সংস্কৃতির সমস্ত আঙিনায় নিজেদের দখলদারি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় বই নয়। এদের অতি সাম্প্রতিক একটি নাট্যপ্রয়াসও লক্ষণীয়। কলকাতার একটি হলে সাপ্তাহিক নিয়মিত নাট্যাভিনয়।

এরা এ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা হিসেবে যে আদর্শ খাড়া করছেন সেটা লোকদেখানো। আরও মর্মান্তিক সেটা নিজেরা জেনে, অনুভব করেও, এমনকি, নিকট বন্ধুটিকে পর্যন্ত তা বলতে পারছেন না। নিজেকেই নিজেরা ঠকাচ্ছেন। এ এক সাংঘাতিক অসহায় অবস্থা। কারণ এঁরা জানেন মরে যাওয়ার হাত থেকে আজকের থিয়েটারকে বাঁচানোর পথ এটা হতে পারেনা, কক্ষনো হতে পারেনা। কারণটা খুব স্পষ্ট - এক, তাঁদের দেখানো পথে হাত-গুন্‌তি বড়জোর দু তিনটি দল হাঁটতে পারে, তার বাইরে নয়। দুই, থিয়েটার যে যে কারণে মরতে বসেছে তার গভীরে যাবার কোনও চেষ্টা নেই এর ভিতরে। তাঁরা বলতে পারেন, আমরা পথ-টথ দেখাচ্ছি না। আমাদের বাঁচার পথ ভাবছি মাত্র। না, এ বললে একজন প্রবীণ কর্মী ছাড় পেতে পারেন না। থিয়েটারকর্মীকে দর্শক তথা জনগনের কাছে জবাবদিহি করতেই হবে।

একটা বয়সে এসে আমরা অনেকেই বলি, 'কী পেলাম?' তখন প্রশ্ন আসবে না? - 'কী চেয়েছিলাম?'। এ পৃথিবী তো আলো-হাওয়া-জল-নীল-সবুজ উজাড় করে দিয়েছে। কেউ যে সেটুকুও পায়নি। এরপরেও 'কী পেলাম'? কী দিলাম, দিতে পারলাম, ভাবলাম না তো।

নিজেকে যদি প্রশ্ন করি আমরা, 'কেন এসেছিলে? কে তুমি? কী কাজ তোমার? কী ছিল যৌবনের স্বপ্ন? কেন ছিল? ভুল? সব? সব ভুল? নিজেকেই ভুলে গেলে? গাড়ি-বাড়ি-টাকা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এ সবের জন্য অনেক তো চোখের জল ফেললে; থিয়েটারের জন্য কি দু এক ফোঁটা জলও ফেলেছো?' - কী জানি, কেমন সব গুলিয়ে যায় না?

এই? এই আজকের থিয়েটার? না, এটা থিয়েটারের খন্ডিত চিত্র, হয়তো চোখ ঝলসানো বড় খন্ড সেটা। কিন্তু আজকের থিয়েটার নয়। আজকের থিয়েটার ছড়িয়ে আছে, গড়ে উঠছে, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে বাংলার আরও অসংখ্য থিয়েটার দলের চর্চার মধ্যে। যাঁরা ঐ ওপরে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে নেই, যাঁরা 'দাদা-ভজা' নন, যাঁরা প্রতি মুহূর্তে থিয়েটারের নানান সমস্যায় জর্জরিত হয়েও মেরুদন্ড সোজা রাখেন, যাঁরা রঙ চিনে নিতে পারেন, যাঁরা নিজের ব্যক্তিত্বকে থিয়েটারের উপরে স্থান দিতে ঘৃণা করেন, যাঁরা মানুষের কল্যাণকর মতাদর্শকে অর্থাৎ সত্যকে আজও নিজেদের মধ্যে দীপশিখার মতো জ্বালিয়ে রাখেন তাঁরাই পারবেন আজকের থিয়েটার গড়ে তুলতে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও অব্যাহত তাদের প্রয়াস। আমরা তাঁদের চিনি না, জানি না হয়তো। এখন সময় এসেছে তাঁদের চিনে নেবার, মর্যাদা দেবার।

আমরা দীর্ঘদিন দেখতে পাচ্ছি সারা বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু প্রতিযোগিতার মঞ্চ। সেখানেও বহু বহু দল নাটক করেন। মঞ্চ এবং প্রধানত আর্থিক কারণে এখানে অভিনয় করা ছাড়া উপায়ও নেই তাঁদের। এখানেও অনেক সিরিয়াস দল আছে। যাঁরা রীতিমত অভিনয় জানেন, থিয়েটার বোঝেন, ভালো প্রযোজনা করেন। কথা বলে দেখেছি - প্রতিযোগিতার মঞ্চ সবসময় তাঁদের প্রকাশের, বিকাশের যথার্থ মাধ্যম হয়ে ওঠেনা। সেখানেও অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে নিরুপায় কাজ করে যেতে হয় তাঁদের। তবু কিন্তু এঁরা কারও মুখাপেক্ষী নন। এঁরাও পথ খুঁজছেন। খুঁজলে পথ পাওয়াও যাবে। কারণ পথ আছে।

আমরা বেশ কিছুকাল ধরে লক্ষ করেছি - কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় এ সমস্ত দলগুলি নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠানের কথা ভাবছেন। কাজও শুরু করেছেন কেউ কেউ। সেই সব থিয়েটারে দর্শক সমবেত হচ্ছেন। আরও একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে - সেটা হল অনেকে ছোটোদের নিয়ে কাজের ক্ষেত্র তৈরী করছেন। কখনও নাটক, কখনও ওয়ার্কশপের আয়োজন করছেন। সবদিক থেকে থিয়েটারকে বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রয়াস। বলা বাহুল্য শুভ ঝোঁক এটি।

এখন সেই সময় যখন এই সব থিয়েটারের মানুষদের পরস্পরের কাছাকাছি আসতে হবে। থিয়েটারকে আবার আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শুধু এসব রচনা লিখে কিছু হবেনা। কারওর ভিত এতে একবিন্দু টলানো যাবেনা। পোড় খাওয়ারা এসব পড়ে বড়জোর একটু করুণার হাসি হাসবেন। তাই শুধুই লেখা বা কথা নয় - কাজ চাই, কাজ। এসব কিছুর জবাব কাজেই দিতে হয়। তাই এই সময়ে দাঁড়িয়ে আসুন - যাঁদের হৃদয় এখনও শেয়াল কুকুরের খাদ্য হয়ে যায়নি - আমরা একত্র হই। শহরে-নগরে-গ্রামে আজকের থিয়েটার গড়ে তুলি। আমাদের পথ প্রদর্শক এবং অস্ত্র হোক সত্য। আসুন আমরা বলি, 'Bombard the Headquarters of destructive thoughts.'

[লেখকের 'অন্তরঙ্গ নাট্য' গ্রন্থের অংশবিশেষ]

কবিতার গল্প

স্বপন রায়

আমি আর সুজয়। হঠাৎই কোলকাতা। হঠাৎ বলেই ট্রেনে উঠে পড়া।
টি টি -র সঙ্গে কথা বলে রিজার্ভেশন। বার্থের দখল আর ট্রেনের
হুইশল একসঙ্গে। তখনো মনে ছিলনা। আমরা গল্প করছিলাম। দেখছিলাম।
চাপা হৈ হৈ। লাগেজ এদিক ওদিক। কাটাকুটি হাসি, মেয়েদের। শুরুর
সময় যেমন হয় ঠিক সেরকমই। আরেকটু পরে টিফিন ক্যারিয়ার, হট-বক্স খোলার
শব্দ আসতে লাগলো। শব্দের মধ্যে কি খিদে থাকে?
লুকিয়ে?
মনে পড়ে গেল আমি আর সুজয় দুজনেই কিছু খাইনি। অনেকক্ষণ। সারা রাতের
জার্নি। চারিদিকে খাদ্যগুণের গুনগুন। আমরা শুনছি, খিদে
আনমনা করে দিচ্ছে। আমার উল্টোদিকের বার্থে একাকিনী। কেন জানিনা, হয়ত
কোনো কাজে। হয়ত কাজের জায়গায়। একা। কম্পার্টমেন্টের নীলচে আলোয় মনে হল
পৌষের রাতে রূপ মিশে যাচ্ছে। রূপোষা। নতুন শব্দ ছাড়া আর কোন বর্ণনায়
এই অসম্পাদিত দৃশ্যের ক্যাপসুলিং সম্ভব ছিলনা।
ক্যাপসুলিং-এর বাংলা কী?
না ভেবে তাকাই। একটু। বেশিক্ষণ তাকালে অন্যরকম ভাবতে পারে।
হ্যাংলা। হাভাতে। আহা, খিদে পেয়েছে। ইত্যাদি।
সুজয়কে বললাম, ভারতবর্ষ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে
সুজয় দেখছিল। মাথা নাড়লো।
আমি আবার বললাম ... সুজয় ভারতবর্ষ ...
সুজয় আনমনে বললো, ভারতবর্ষ এখন কোথায় ... ও মাল তো কবেই টেঁসে গেছে
- কোন্ ভারতবর্ষ?
- পত্রিকার কথা বলছিস তো?
- দূর! দেশ ... তুই ভাব কতো মানুষ বি. পি. এল. এখনো এই দেশে
সুজয় বিরক্ত।
বললো, বি. পি. এল. যতোই ভালো হোক আমার ভোট এল. জি.র দিকে
মেয়েটি কি হাসছে?
হাসলে তরঙ্গ হয়, জানলাম।
সুজয়কে বলা হলনা বি. পি. এল মানে বিলো পভার্টি লাইন ...
বলা হলনা কারণ খিদে এবং সৌন্দর্য যখন লেনদেন করে তখন কথা হয়না।

বলা হয়না। জানলা দিয়ে তাকাই। অরুন্ধতি, অরুন্ধতির ক্রিম, শীত এলে
কেকের গন্ধও। আর ক্রিম, কেক, খাওয়া, মাখা, ব্যবহারের আলাদা উপযোগিতায়।
সুজয় এখন ক্ষুৎকাতর। শারীরিক সেই চাপের মুহূর্তে যেন কোন

স্খলন না হয় এমন উদাসীনতা এনে চাপা গলায় গেয়ে
ওঠে এক বাংলা বনে নেয়ারা ... তখনো পৃথিবী
শ্রেণিবিভাজিত, আদর্শের লাল তারা কাল্পনিক হলেও মঙ্গলগ্রহের
দ্যুতিকে ম্লান করে বুর্জোয়াদের অযৌক্তিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার
স্বপ্ন দেখছে। কত স্বাপ্নিক দিকে দিকে। আর সুজয় খিদের
জ্বালায় ছটফট করতে করতে গাইছে ওর একটি সুন্দর বাংলো বাড়ি
চাই ... প্রিয় বাংলো বাড়ি ... কে বাংলা বনে নেয়ারা ...
শ্রেণিশত্রু আর কাকে বলে?
সুজয়ের সেই অবদমিত গানের মাঝখানেই কামরার আলোগুলো
নিভতে আরম্ভ করে। সামনের বার্থে শায়িতা হয় নিসর্গের জন্য
তুলে রাখা রিলিফ। ঘুম নামে। আমি আর সুজয় দুটো মাঝখানের
বার্থে খাদ্যসমস্যা নিয়ে কথা বলতে শুরু করি। পেটে ডন মারছে। আগুন
জ্বলছে। একটু ইয়ার্কি ঃ ছুঁচোগুলোর কী হবে রে! আবার খাদ্যবস্তু নিয়ে
সম্ভাবনার তালিকা। আজ রাতটাই তো। ভোরেই হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে
হিঙের কচুরি। ঝাল ঝাল তরকারি। গরম চা। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে
যাবে। তাছাড়া কচুরি কেন? দোসা আছে। আলুর পরোটা। দম।
আর খিদে মশার মত ভনভন করতে থাকে। পেটেই।
সুজয় উঠে বসে। জল খায়। আমিও।
#
- আপনাদের খুব খিদে পেয়েছে না?
মৃদু বাংলা ভাষায় কে জিজ্ঞেস করলো। খিদে তো পেয়েইছে। কিন্তু
জানল কী ভাবে?
নিচের বার্থে আভা। রূপৌষা উঠে বসেছে। একটু মুখ তুলে জিজ্ঞেস
করছে আমাদের।
সুজয় স্মার্ট হতে শুরু করে। বলে, না, না ... একটা রাত তো ...
দেখতে দেখতে কেটে যাবে ...
মেয়েটি হাসে। হাসির মধ্যে হাঁসের পালক থেকে জল ঝরার শব্দ।
আমার ফিউজ উড়ে যায়।
বলতে চাই। পারিনা। স্মার্ট সুজয়ও 'না' বলে দিয়ে ঘাবড়ে গিয়েছে।
আমরা দুজনেই ভাবছি মেয়েটি নিশ্চয় আরেকবার বলবে। আমরা
অপেক্ষা করছি, মেয়েটি চুপ। কীসব আনপ্যাক করছে। করা
শেষ করে আবার উপরে তাকালো।
অমান্য করা যাবেনা এমন নির্দেশ দিয়ে বললো, চুপচাপ
নেমে আসুন।
সমস্ত ক্ষুৎকাতরতা ছেড়ে আমরা নেমে আসি।
এই পতনকে 'পতন রে' বলা যায়। এমন কি তুহু মমও ...
দুটো আলাদা শালপাতার থালায় রকমারি।
মেয়েটির হাস্যতা টপিংসের কাজ করছে। নতুন চাকরি পেয়ে

কলকাতা। বাড়ির লোক ঠেসে দিয়েছে। এত খাওয়া যায় নাকি!
কথা চলতে থাকে। খাওয়া শেষ হয়। আমরা তিনজন
বসে থাকি। গান নিয়ে, গল্প নিয়ে, সিনেমা নিয়ে বসে থাকি।
দুজন তরুণ, একজন তরুণী। কথা শেষ হবে কেন? ঠিকানা, নাম,
সব জানার পরেও কথায় কথায় অনেক গভীর রাত চিরে ট্রেন ছুটে
যাচ্ছিল।
#
এরপরে কিছু হয়নি। মেয়েটি দমদম আর আমরা যাদবপুরে
চলে গিয়েছিলাম। যে যার মতো। এসব নিয়ে কোন কবিতাও লিখিনি।
কবিতায় গল্প কেন, এরকমই তো ভেবেছিলাম। তবে ওই ডাক।
রাতের ট্রেনে অসম্ভব ডেকে ওঠা, বিলি কাটার আদলে প্লেটে
খাদ্যবস্তু তুলে দেয়া হাসির মধ্যে হাঁসের পালকচ্যুত
জলের শব্দ আর কথার কথাময়ী হয়ে ওঠা এসবই আলাদাভাবে
রয়ে গিয়েছিল। এই সূত্র, এই বিন্দু, এই বিভ্রম আর চকিতবিদ্যুৎ।
এসবই কবিতায় এসেছে।
#
কবিতার ভেতরে রয়ে গেছে একটি মেয়ের অল্প আঙুল, ইচ্ছে, শব্দাবলী
আর অপূর্ণ জার্নির অবিষয়। বিষয় হলে মেয়েটি খাদ্যবস্তু হয়ে উঠত।
হয়ত পণ্যও। যে বৈষয়িক তার তো সীমানাও আছে। ফ্রেম আছে।
#
আমি তাকে ফ্রেমে রাখতে চাইনি। ছেড়ে দিয়েছি।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি : ফেলে আসা ২০০২

শেষ হল আরও একটা বছর। বিগত বছর যদি ২০০২ নাহয়ে গত শতকের বিশের বা ত্রিশের দশক হত, আমরা তবে আশা করতে পারতাম গত বছরে ঘটে গেছে বিজ্ঞানের জগতে এমন কোনও নিঃশব্দ বিপ্লব, যার কথা মানবসভ্যতার ইতিহাসের মোড় আরও একবার ঘুরিয়ে দেবে, যেমন দিয়েছিল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বা ম্যাক্স প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম ফিজিক্স।

কিন্তু যুগটা যতটা না বিজ্ঞানের তার চেয়ে বেশি প্রযুক্তির। গত কুড়ি বছরে মানবসমাজের উন্নতি নিয়ে যতই আস্ফালন করিনা কেন, মানবসভ্যতার উদ্বর্তন এখন technological evolution; শিলপকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান কিছুটা যেন গৌণ। তাই ২০০২ সালে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জগতে সাড়াজাগানো ঘটনাগুলি আমরা ছুঁয়ে দেখব - কতটা পেলাম, আর কতটা হারালাম।

১. মৌলিক কৃতিত্ব:

প্রথম খবরটা সব ভারতীয়র গর্ব করে বলার মতো। কম্পিউটার দিয়ে যেসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তাদের মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় - P শ্রেণি ও NP শ্রেণি। P শ্রেণির সমস্যাগুলি তুলনামূলকভাবে সমাধানযোগ্য। অন্য শ্রেণির সমস্যাগুলির সমাধান অনেকবেশি সময়সাপেক্ষ। আবার অনেক সমস্যা আছে, যারা P বা NP -কোন্ শ্রেণিভুক্ত এখনও জানা যায়নি। এইরকম একটি বিখ্যাত সমস্যা ছিল পূর্ণ সংখ্যার মৌলিকত্ব (primality) নিরূপণ। কিন্তু এখন আর নেই। গতবছর আই. আই. টি. কানপুরের দুজন ছাত্র নিরজ কয়াল, নিতিন সাক্সেনা আর তাঁদের অধ্যাপক মণীন্দ্র আগরওয়াল প্রমাণ করে দিয়েছেন সংখ্যার মৌলিকত্ব নিরূপণ সংক্রান্ত সমস্যাটি P শ্রেণির অন্তর্গত। কম্পিউটার বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তোলা এই প্রমাণ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিদেশে সাড়া পড়ে যায়।

২. সৌর-নিউট্রিনো ধাঁধার সমাধান?

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় বহুদিন ধরে সমাধান না হওয়া সমস্যা হল সৌর-নিউট্রিনো রহস্য। কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার ব্যাসের পারমাণবিক চুল্লি সূর্য থেকে অনবরত নিউট্রিনো কণা সৌরজগতে বর্ষিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো তার যে অংশ পৃথিবীর বুকে এসে আছড়ে পড়া উচিত, রহস্যজনকভাবে একেবারে আধুনিক প্রযুক্তির উন্নত সেন্সারের সাহায্যেও ততগুলো নিউট্রিনো কণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায়নি। এই রহস্য গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বের তাবড় তাবড় পদার্থবিদদের হতবাক করে রেখেছিল। ২০০২ -তে জাপান ও কানাডায় কতিপয় বিজ্ঞানী টয়োমা আর সাডবেরির খনিগর্ভে পরীক্ষা চালিয়ে অবশেষে জটিল এই ধাঁধার হদিস পেয়েছেন। তাঁদের মতে নিউট্রিনো কণারা হারিয়ে যায়না, তাদের রূপভেদ ঘটে ইলেকট্রন, মিউওন আর টাউ কণাতে।

৩. স্বল্পখ্যাতির মৌল

স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান বইতে আমরা পড়ি এই মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক মৌলের সংখ্যা ৯২টি। আর মানুষের তৈরি কৃত্রিম মৌল আরও ১৩টি - সবমিলিয়ে মোট ১০৫টি মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান। বিজ্ঞজনেরা খবর রাখেন, মাঝেমধ্যেই পদার্থবিদরা গবেষণাগারে একটি-দুটি নতুন কৃত্রিম মৌল নির্মাণ করার প্রয়াস করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে এইভাবেই গতবছর নির্মাণ করা হয় '১১৮ পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট' একটি মৌল। হায়, মহাবিশ্বের সবচেয়ে ভারি মৌলের সম্মান পেতে পারত যে বস্তুটি তার খ্যাতি হল বড়ই স্বল্পস্থায়ী। কেলেঙ্কারির ভয়ে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিলেন তাঁরা নতুন কোনও মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করতে পারেননি, পুরোটাই ছিল ভাঁওতা। বড়ো জানতে ইচ্ছে করে অতো খেটেখুটে তাঁরা যা বানিয়েছিলেন সেটি কী জিনিস?

৪. প্রতারক

ছোটবেলায় স্কুল ক্রিকেটে প্রিয় দলের হয়ে স্কোরকার্ড সামলেছেন? কিংবা কলেজের ফিজিক্সের ল্যাবে করেছেন কোনও দুরূহ এক্সপেরিমেন্ট? তাহলে নিশ্চয়ই জানেন এরকম পরিস্থিতিতে একটু আধটু 'জল মেশালে' বিশেষ দোষঘাট হয়না। এই ধরুন এক্সট্রা রানের সংখ্যা একটা - দুটো বাড়িয়ে দিলেন, কিংবা একটা রিডিং একটু হেরফের করে দিলেন। কিন্তু একই কাজ করেন যখন বেল ল্যাবের কোনও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, তাঁর আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রে? জ্যান হেন্ড্রিকসন প্রায় নোবেল পেতে চলেছিলেন, যদিনা তাঁর সতীর্থরা তাঁর জালিয়াতি হাতেনাতে ধরে ফেলতেন। অভিযোগ, বিজ্ঞানী তাঁর একাধিক বিশ্ববিশ্রুত পেপারে মনগড়া সব তথ্য আর বৈজ্ঞানিক ফলাফল প্রকাশ করেছেন। সস্তা হাততালি কুড়োনোর আশায়। জ্যানের চাকরিটা আপাতত গেছে, কিন্তু গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল অস্বস্তিতে ভুগছেন। সত্যসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর অসত্যের আশ্রয় নেবার মধ্যে কোন্ পতনোন্মুখ বিশ্বের পূর্বাভাস?

৫. মোদের গরব, মোদের আশা

বাঙলা লেখার জন্য তো অনেক সফট্অয়্যার ব্যবহার করেছেন। আপনাদের অভিমত জানিনা, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, কোনওটাই ঠিক নিখুঁত না। বেশিরভাগ সফট্অয়্যারেই পেশাদারিত্বের একটা শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করা যায়। একবার ভাবুন, আপনার পছন্দের ওয়ার্ডপ্রসেসর Microsoft Word -এই যদি বাংলা লিখতে পারতেন কতটা সুবিধে হত।

আপনাদের ইচ্ছে সম্ভবত পূরণ হতে চলেছে। ২০০৩ এর অক্টোবরে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন তাদের জনপ্রিয় দুটি সফটঅয়্যার Windows আর Office -এর বাংলা সংস্করণ বের করবে। মাইক্রোসফটের Indic কর্মসূচীর এটি তৃতীয় ধাপ (ইতিপূর্বে Office-এর হিন্দী ও তামিল সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে মাইক্রোসফটের সাম্প্রতিককালে সাক্ষরিত মউ-এর ফলশ্রুতি এই বঙ্গীয় প্রয়াস কিনা জানা নেই, তবে ভবিষ্যতে বাংলা প্রেমী বহু মানুষ কম্পিউটারে তাঁদের ভাষাকে আরও সহজে ব্যবহার করতে পারবেন বলে মনে হয়।

৬. অবিরাম-গতি যন্ত্র

যাঁরা কৈশোরে ইয়া. পেরেলম্যানের 'পদার্থবিজ্ঞানের মজা' নামে অসাধারণ গ্রন্থটি পড়ে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে 'অবিরাম-গতি যন্ত্র'-এর কথা, যা ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন শক্তির উৎস। এখন তো আমরা সকলেই জানি অবিরাম-গতি যন্ত্র পরশপাথরের মতোই অসম্ভব বস্তু। তবে যুক্তরাষ্ট্রে বুদাপেস্ট ওয়াচ কোম্পানির ঘড়ি নির্মাতা স্টিভেন ফিলিপস যা বানিয়েছেন তাকে প্রায় অবিরাম-গতি যন্ত্র বলা যায়। তাঁর নির্মিত ঘড়ি ব্যাটারি বা সৌরশক্তিতে চলে না, তাতে দম দিতে হয়না এমনকি হাতেও পরে থাকতে হয়না। সারাদিনে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন হয় তার থেকেই এই ঘড়ি শক্তি সংগ্রহ করে। তাপমাত্রার সূক্ষ্মতম ওঠাপড়াই ঘড়িকে চালু রাখার জন্য যথেষ্ট - ফিলিপসের দাবি। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর শিল্পনৈপুণ্যের (Craftsmanship) এক অসমান্য উদ্ভাবন, সন্দেহ নেই।

৭. ভ্রাম্যমাণ টেলিফোন বুথ

ভারতের অনেক গ্রামেই এখনও টেলিফোন সংযোগ নেই, অথবা থাকলেও দূরভাষের ব্যয়ভার বহন করার সাধ্য অনেকেরই নেই। তবে মহম্মদ পাহাড়ের কাছে না গেলেও টেলিফোনই এবার এসে যাবে সকলের ঘরে ঘরে। ডাক বিলি করতে আসা পোস্টম্যানের সঙ্গে থাকবে WLL-হ্যান্ডসেট, সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে দূর দুরান্তের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, অবসান হবে উদ্বেগের। BSNL-এর ৩০০০ কোটি টাকার দূরদর্শী পরিকল্পনায় অংশ নেবেন দেশব্যাপী প্রায় আঠেরোশ পোস্টম্যান, উপকৃত হবেন আট হাজার গ্রামের বাসিন্দা। WLL-ফোন পরিষেবা থেকে STD/ISD করার সুবিধে থাকবে। অভিনব এই পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে রূপায়িত হলে গ্রামীণ ভারতবর্ষ সত্যি সত্যিই তথ্যপ্রযুক্তির শতকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঢুকে পড়বে।

উত্তরমালা

শব্দকল্পদ্রুম ঃ
পাশাপাশি

১ সনাতন
৪ বয়োতীত
৭ প্রলাপ
৯ বাট
১০ ক্রকচ
১১ নিরাকার
১৪ কমল
১৫ সালতামামি
১৮ কর্মসাক্ষী
১৯ জিদ
২১ খল
২২ নিম
২৩ হর
২৪ রামদা
২৫ বাগবিশারদ
২৯ মানিক
৩০ খতরনাক
৩১ প্রজ্ঞা
৩২ ণত্ব
৩৪ বাগড়া
৩৬ জাত
৩৭ রম
৩৯ রূপ
৪০ প্রমা
৪৩ গোবিন্দ
৪৫ তিমি
৪৭ পণ
৪৮ হাতখরচ
৫১ সঙ্কাশ
৫২ পরাশর বর্মা
৫৩ কৌরব
৫৪ বিলি
৫৬ ওলা
৫৭ ধারা
৫৯ সতী
৬০ করতোয়া
৬১ বসনহীন
৬৪ বেদম
৬৬ লাভক্ষতি
৬৮ বাতাবি
৭০ মান
৭১ আনন
৭২ নরদেব
৭৩ প্রজনন

উপর-নিচ

১ সবাক
২ নাটমন্দির
৩ নক্র
৪ বচসা
৫ তনিমা
৬ রাকা
৮ লালসালু
১২ রামি
১৩ রকমরকম
১৬ লখ
১৭ তালবাখড়া
১৯ জিরানিয়া
২০ দমক
২২ নিশানা
২৩ হরিণ
২৬ গত
২৭ বিরসা
২৮ অজ্ঞাত
৩১ প্রজাপতি
৩৩ ত্বরমাণ
৩৫ গলা
৩৮ কবি
৪০ প্রপঞ্চ
৪১ পাহারাওয়ালা
৪২ আখর
৪৩ গোচর্মাধান
৪৪ কঙ্কাবতী
৪৬ মিতালি
৪৯ তশলা
৫০ রব
৫১ সরস
৫৪ বিবদমান
৫৫ হরতন
৫৮ রাহী
৬১ বক্ষ
৬২ সতিন
৬৩ নবাব
৬৫ মনন
৬৭ ভর্তা
৬৯ বিপ্র

ধন্ধমধুর

এক. জোড়-বিজোড়ের ধাঁধা

যখনই দুই ব্যক্তি করমর্দন করেন, তখনই পৃথিবীতে মোট করমর্দন সংখ্যা বেড়ে যায় দুটি করে। সুতরাং এখন অবধি মোট করমর্দন সংখ্যা জোড়। এর মধ্যে জোড় সংখ্যক করমর্দন করা ব্যক্তিরা মিলিত ভাবে যতবার করমর্দন করেছেন সেই সংখ্যাটি জোড়। অতএব, বিজোড় সংখ্যক করমর্দনকারী ব্যক্তিরাও মিলিত ভাবে জোড় সংখ্যক বার করমর্দন করেছেন। অতএব এমন ব্যক্তির মোট সংখ্যাটিও জোড়।

দুই. তাসের ম্যাজিক

ক: ২২ খ: ১৪ গ: ১২

তিন. উপহার

কমলিকা চ্যাটার্জি আসলে অনলের মা। তাহলেই দেখবেন হিসেব মিলে যাচ্ছে।

চার. জন্মসনের সমস্যা

দাদু ১৮৭০, নাতি: ১৯২০

খুঁজি খুঁজি নারি

চরিত্র ঃ
বাদল
ঋত্বিক ঘটক
জনমেজয়
সলিল
কণিকা

প্রকৃতি ঃ
শালিক
হিমাচল
তিতাস
তপোবন
কর্ণফুলি

কনকলতা

মেঘবালিকা

সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ
জাতিস্মর
উলঙ্গ রাজা
মেঘনাদবধ কাব্য
কালবেলা
রক্তকরবী

উৎসব ঃ
দই
বরণডালা
সিঁদুর
মন্দির

ইন্দিবর

লালদরজা

শেষ সমাধান ঃ কলকাতা বইমেলা

With best compliments from:

ত্নট্ট ন্দ ট্রথন্দন্ডট্রবঢথত্ত্ব

Shop No. V-13, Technology Market
IIT Kharagpur, West Midnapur

Deals with:
Study Aids, Office Stationaries, Greeting Cards, Art-n-Drawing Materials, Children's Books & Games, Gift-n-Novelties, etc.

Wish you all A Happy New Year.

অন্নপূর্ণা সুইটস্

প্রেমবাজারের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা

এখানে রসমালাই, ক্ষীরকদম, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ, কালাকান্দ, মিষ্টিদই পাওয়া যায়

এখানে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অর্ডার নেওয়া হয়

প্রেমবাজার ★ খড়্গপুর

With best compliments from:

Phone: 277416

Bhattacharjee Enterprise

DVC Market

All kinds of Paints, Sanitary Wares, Pumps, Pipe & Sintex Available here.

With best compliments from:

Phone: (033)26881803
(033)26881549

TREK N' TRAVEL ZONE
Indrajit Bose

- Trekking equipments available on hire
- Trek/tour conductor
- Cycle/Motorcycle expedition organiser

367, Sarat Chaterjee Road,
Bataitala Bazar, Howrah
PIN 711103
West Bengal

A
Well
Wisher

ন্থান্তু

DVC Market

With best
compliments from:

DAYA RAM GUPTA

Fruit And Stationary
Canteen

(মুড়ি স্পেশালিস্ট)

Nehru Hall,
IIT Kharagpur

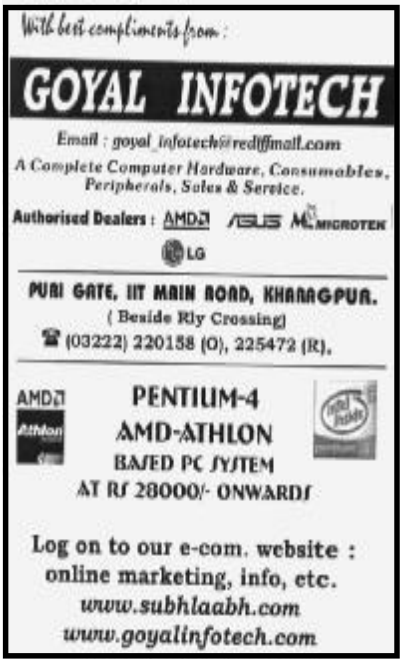

PRINTEK POINT

Tech Market,
IIT Kharagpur

With best compliments from:

RESI: (03222) 258933
SHOP: (03222) 279712
MOBILE: 9832110152

হুগুটুত্ম

DECORATORS & CATERER

OM KUMAR SWEETS

PURI GATE, I.I.T. MAIN ROAD, KHARAGPUR

With best compliments from:

Phone: 277523 (shop)
278514 (resi)

Authorised Dealer of

STEELUX
and
SAGAR STEEL ALMIRAH

ঠহত্মত্বচবহত্মঃ গুহএ্গহগু

DVC Market, Kharagpur - 6
(Near IIT Campus)

Best quality wooden furniture manufactured here

Factory at Talbagicha (Near Shiv Mandir)

With best compliments
from:

DHAR & COMPANY PRIVATE
LIMITED

HOWRAH AMTA ROAD
HOWRAH - 711105
WEST BENGAL

With best compliments from:

এহুডজ্ঞত্মক্রটত্ত্ব ঔটচত্মটট্রটবগুত্মত্র

BALIKHAL,
HOWRAH